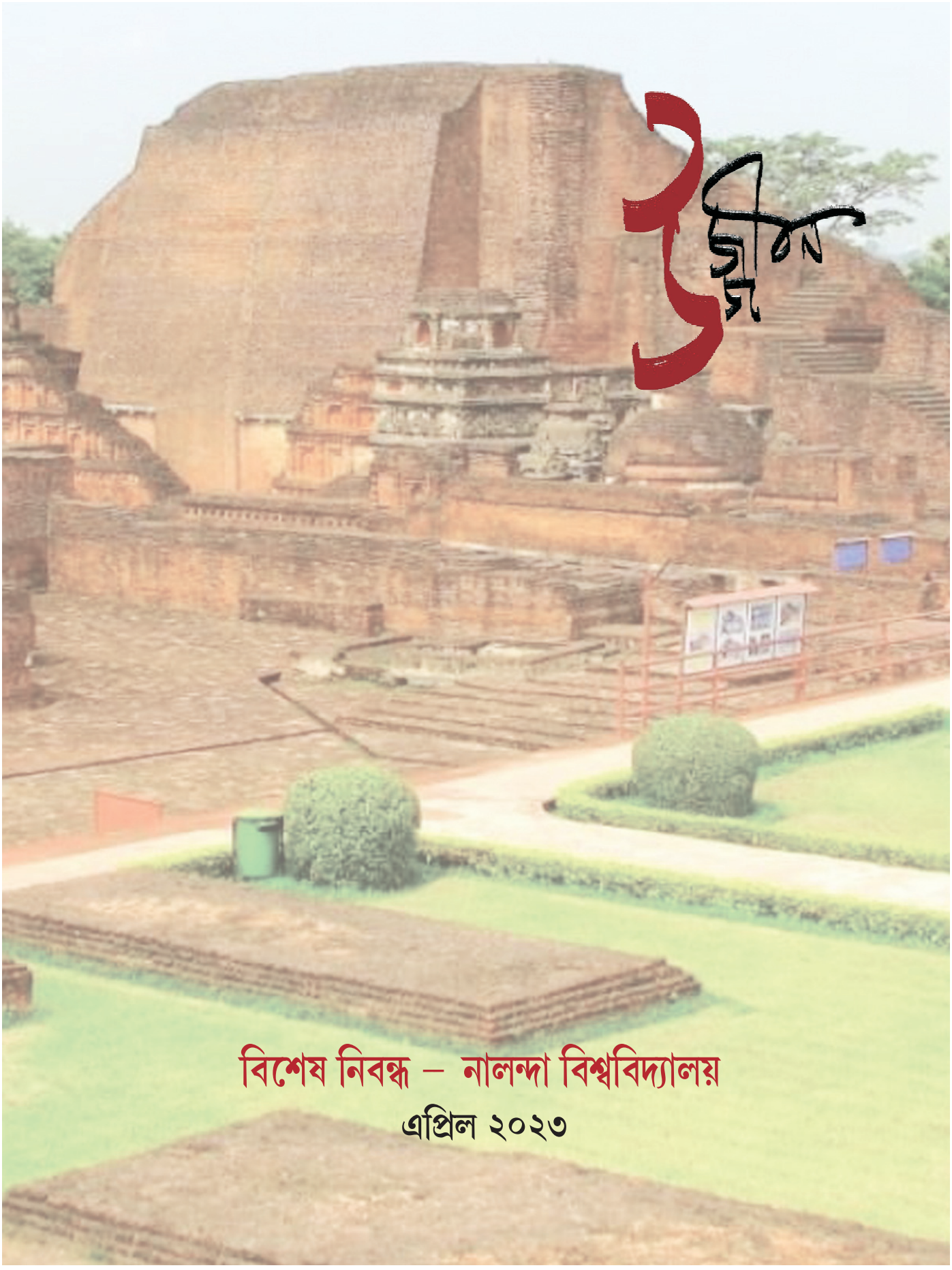

বিশেষ নিবন্ধ – নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল ২০২৩

আর নয় ভেলোর

M.R.HOSPITAL

Sharing Love, Caring Humanity

YOUR HEALTH IS OUR PRIORITY

আমাদের পরিষেবা সমূহ

- বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
- ফিজিক্যাল মেডিসিন
- ফেয়ার প্রাইস প্যাথলজি
- এন্ডোস্কপি
- ব্রঙ্কোস্কপি
- সি টি স্ক্যান
- সাইক্রিয়াট্রিক
- ই.এন.টি ও হেড নেক
- সার্জারি
- কেমোথেরাপি
- ডেন্টাল
- ফেসিও ম্যাগজিলারী
- সার্জারি
- জেনারেল মেডিসিন
- জেনারেল সার্জারি
- নিউরো ও স্পাইন সার্জারি
- ওপেন ও ল্যাপরোস্কপি
- সার্জারি
- কার্ডিওলজি
- পেসমেকার
- স্ত্রী-রোগ
- হাই-রিস্ক প্রেগন্যান্সি
- পোষ্ট কোভিড ক্লিনিক
- চোখের যাবতীয় চিকিৎসা
- ও.পি.ডি
- আ.সি.ইউ
- এন.আই.সি.ইউ.
- ২৪ ঘন্টার ইমার্জেন্সিও ট্রমা
- কেয়ার
- জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট (কোমর ও হাঁটু)
- অত্যাধুনিক ল্যাবোরেটরি
- ডায়াগানেস্টিক
- ইন্ডোর ও আউটডোর পরিষেবা
- পেইন ক্লিনিক
- এক্স-রে
- ডায়ালিসিস
- ব্লাড ব্যাঙ্ক
- শিশু ও নবজাতক রোগ বিশেষজ্ঞ
- চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞ
- শারীরিক ঔষধ ও পুর্নবাসন
- ইউ.এস.জি
- বক্ষ রোগ বিশেষজ্ঞ
- চর্ম রোগ বিভাগ
- ডায়টেশিয়ান
- AC/ICU অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা
- ভরসা কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা
- কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমস্ত
- স্বাস্থ্য পরিষেবা
- সকল প্রকার Health Insurance

M.R. HOSPITAL

Vill. & P.O - Balisha, P.S. - Ashoknagar , North 24 Parganas,
Near Bira Rail Station West Bengal , Pin - 743234

9734214214
9051214214

24/7 Emergency Services

www.mrhospital.org

Al-Ameen Mission

Regd. Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah, Ph.: 74790 20059
Central Office: 53B Elliot Road, Kolkata 700 016, Ph.: 74790 20076

SUCCESS AT A GLANCE : 2020

Dazzling Record in NEET (UG)

Marks 626 & above Within AIR 9908 — 61	Marks 600 & above Within AIR 20174 — 134	Marks 580 & above Within AIR 30431 — 238
Marks 565 & above Within AIR 39289 — 322	Marks 550 & above Within AIR 49260 — 434	Marks 536 & above Within AIR 59825 — 516

AIR 916 (675)
Jisan Hossain

AIR 1276 (670)
Tanbir Ahmed

AIR 1522 (666)
Md Samim

AIR 1982 (662)
Ayesha Khatun

AIR 2298 (660)
Al Taufeeq

AIR 2817 (656)
Kanen Akhtar

AIR 2947 (655)
Md Tarip Sk

Higher Secondary (12th) Examination

Board	Appeared		90%	80%	70%	60%
WBCHSE	Science	2090	909	1928	2072	2089
	Arts	79	43	66	78	79
CBSE	Science	54	8	24	43	54
	Total	2223	960	2018	2193	2222

Appeared 2223	
From Poor & BPL families	605 (27%)
From lower-middle income group	775 (35%)
From middle & upper middle income group	843 (38%)

81 students have occupied their positions within 20 ranks in the H.S. exminations of the Council

2nd 498 (99.6%) Md Talha

7th 493 (98.6%) Shayma Sultana

9th 491 (98.2%) Qaseed Akhtar

9th 491 (98.2%) K Abdul Halim

9th 491 (98.2%) Junaid Ahmmed

Secondary (10th) Examination

Board	Appeared		90%	80%	70%	60%
WBBSE	Boys & Girls	1706	461	1211	1557	1668
CBSE	Boys & Girls	71	21	48	64	70
	Total	1777	482	1259	1621	1738

Appeared 1777	
From Poor & BPL families	627 (35%)
From lower-middle income group	680 (38%)
From middle & upper middle income group	470 (27%)

15 students have occupied their positions within 20 ranks in 10th exam.

7th 686 (98%) S Md Tameem

8th 685 (97.9%) Md Tahenuzzaman

15th 678 (96.7%) Mir Mousumi

16th 677 (96.7%) Sk Atiulla

17th 676 (96.6%) Sk Tafhim

To prepare yourself as an Ideal Teacher,
Join our Institutions...
M.R. COLLEGE OF EDUCATION
(B.Ed. & D.El.Ed.)
Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.
BIRA, BALISHA, P.S- ASHOKNAGAR, (N) 24 PGS, WB-743234
www.mrctrust.org, Email- mrctrust2012@gmail.com
Phone- (03216)-261082, Mobile- 9933163040
SAHAJPATH
(B.Ed. & D.El.Ed.)
Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.
BIRA, BALISHA, P.S- ASHOKNAGAR, (N) 24 PGS, WB-743702
www.sahajpath.org.in, Email- sahajpath2010@gmail.com
Phone- (03216)-260058, Mobile- 9932563040
MOTHER TERESA INSTITUTE
OF EDUCATION & RESEARCH
(B.Ed. & D.El.Ed.)
Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.
NADIBHAG, P.O- KAZIPARA, P.S- MADHYAMGRAM, (N) 24 PGS, KOL-125
www.mtier.in, Email- secretary.mother@gmail.com
Mobile- 9051073449
DR. SHAHIDULLAH
INSTITUTE OF EDUCATION.
(B.Ed. & D.El.Ed.)
Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.
AMINPUR, P.O- SONDALIA, P.S- SASHAN, (N) 24 PGS, WB-743423
www.dsie.in, Email- secretary.dsie@gmail.com
Mobile- 9051072035
Founder
Dr. Jahidul Sarkar
Mobile- 9734416128 / 7001575522

মাসিক

উজ্জীবন

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ-এর মুখপত্র

এপ্রিল ২০২৩
কলকাতা

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ

সভাপতি : আমজাদ হোসেন

সম্পাদক : সাইফুল্লা

কোষাধ্যক্ষ: মীর রেজাউল করিম

উজ্জীবন

সম্পাদক : সাইফুল্লা

নির্বাহী সম্পাদক : ইনাস উদ্দীন, জাহির আব্বাস

সম্পাদক মণ্ডলী : অনিকেত মহাপাত্র, আজিজুল হক, আবু রাইহান, আমিনুল ইসলাম, তৈমুর খান, পাতাউর জামান, ফারুক আহমেদ, মীজানুর রহমান, মুসা আলি, মুহম্মদ মতিউল্লাহ, শেখ হাফিজুর রহমান, সাজেদুল হক, সুজিতকুমার বিশ্বাস

উপদেষ্টা মণ্ডলী : আলিমুজ্জমান, খাজিম আহমেদ, জাহিরুল হাসান, মিলন দত্ত, মীরাতুন নাহার, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, লোকমান হাকিম, সামশুল আলম, স্বপন বসু

প্রচ্ছদ : প্রিয়ব্রত ভাণ্ডারী (**নাম-লিপি :** সম্বিত বসু)

বর্ণ সংস্থাপন : বর্ণায়ন

বিনিময় : ৫০ টাকা

যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩৩৬১১৬৩৭

ই মেল : ujjibanmag@gmail.com, aliahsanskriti@gmail.com

ই মেল এ লেখা পাঠান অথবা ব্যবহার করুন এই ঠিকানা :

মীর রেজাউল করিম, ৩৮ ডা. সুরেশ সরকার রোড, পশ্চিম ব্লক (তৃতীয় তল), কলকাতা-১৪

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, নিউ লেখা প্রকাশনী, মল্লিক ব্রাদার্স, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন

'উজ্জীবন' আলিয়া-র পরিবর্তিত নাম

সংসদ-সংবাদ ২০২২

বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'উজ্জীবন ২০২৩' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ১২ মার্চ, ২০২৩ রবিবার, পার্ক সার্কাসে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সভাকক্ষে। সংসদের বিগত দিনের কার্যাবলীর পর্যালোচনা সহ এদিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিশিষ্টজনদের পুরস্কার প্রদান।

সূচনায় স্বাগত বক্তব্যে সংসদ-সম্পাদক অধ্যাপক সাইফুল্লা বলেন, যে করোনা-মহামারী জয় করে ২০২২ থেকে আমরা আবার অফলাইনে সংসদের বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি এবং সেই ধারাতেই আজকের এই আয়োজন। সম্পাদক জানান, প্রতিবন্ধকতা ছিল, তবে তার মধ্যেও সংসদের কাজকর্ম বন্ধ থাকেনি। প্রকাশনা বিভাগ থেকে ইতোমধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। আগামী দিনের জন্য বিশেষ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সংস্থার মুখপত্র, মাসিক 'উজ্জীবন' নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। জানুয়ারি সংখ্যা ইতিমধ্যেই পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে। ফেব্রুয়ারি সংখ্যা এই অনুষ্ঠানেই প্রকাশিত হবে। এছাড়া উল্লেখ্য বিষয় হল, পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯৬১ অনুসারে 'কলকাতা আলিয়া সাংস্কৃতিক সমিতি' নামে সংসদের নিবন্ধীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। শহর ও মফফ্সলের মূলত শিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভিতরে জ্ঞান চর্চা, সংস্কৃতি চর্চা, প্রগতিশীলতার বোধ এবং অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনা জাগিয়ে তোলাই সংসদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তার জন্য প্রয়োজন মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল শুভানুধ্যায়ী মানুষের সহমর্মিতা এবং আন্তরিক সহযোগিতা। উপস্থিত গুণীজনদের এই কর্মযজ্ঞে যথাসম্ভব পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের সূচনায় কলকাতা শহরে নজরুল চর্চায় অন্যতম পরিচিত সংগঠন 'ছায়ানট' সংস্থার সদস্যগণ 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা', 'কারার ওই লৌহ কপাট', 'ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ', 'জয় হোক, জয় হোক, শান্তির জয় হোক' প্রভৃতি নজরুল সংগীত পরিবেশন করেন। নেতৃত্বে ছিলেন সংস্থার কর্ণধার সোমঋতা মল্লিক। এছাড়া অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন মেঘ মুখোপাধ্যায়, নিজের লেখা ইসলামি গান গেয়ে শোনান আছিয়া বেগম।

বিভাগীয় সম্পাদকগণ সংসদের বিভিন্ন কাজকর্মের প্রতিবেদন পেশ করেন। সামাজিক গবেষণা বিভাগ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুহম্মদ আফসার আলি উল্লেখ করেন, যে শিক্ষা বিস্তারে মুসলমানদের অবদান, ঐতিহাসিক সৌধ, ওয়াকফের সম্পত্তি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিষয়ে অনুসন্ধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উৎসব অনুষ্ঠান উপসমিতির অধ্যক্ষ অধ্যাপক শেখ কামাল উদ্দিন বলেন, গত জুন মাসে বারুইপুরে সংসদের পক্ষ থেকে একটি সাংস্কৃতিক সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । আগামীতে রবীন্দ্র- নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠান, মাতৃভাষা দিবস, ঈদ সম্মিলনী এবং নবী দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকাশনা বিভাগের পক্ষে হাফিজুর রহমান জানান, যে ইতোমধ্যেই 'সওগাত' সম্পাদক নাসিরউদ্দিন, 'মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক মুজিবুর রহমান ও নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর জীবনী এবং সোহরাবর্দী পরিবারের ইতিহাস সম্বলিত পুস্তক 'সোহরাওয়ার্দী পরিবার : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার', প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব চতুরঙ্গ সম্পাদক আবদুর রাউফ বিষয়ক 'স্মরণ আবদুর রাউফ' সংসদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালি মুসলিম মনীষা ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের তথ্য কেন্দ্রিক একটি বাঙালি মুসলিম চরিতাভিধান প্রকাশের কাজ চলছে। ২০২৩ সালে কবি শাহাদাত হোসেন, মৌলানা ভাসানী এবং কথাকার লুৎফর রহমানের জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে গবেষণাধর্মী পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। 'উজ্জীবন' মাসিক পত্রিকার পক্ষে ইনাস উদ্দীন জানান, ২০২৩ সালের প্রথম থেকে নতুন আঙ্গিকে পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও স্বেচ্ছাসেবী কয়েকজন তরুণ তরুণীকে নিয়ে একটি কার্যকরী টিম গঠিত হয়েছে। পত্রিকার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সাহিত্য-প্রতিভাকে পরিচিতির অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এক সমৃদ্ধ পাঠক গোষ্ঠী গড়ে তোলা। এর জন্য পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। বর্তমানে মাত্র দুই শত স্থায়ী গ্রাহক

আছেন। 'উজ্জীবন'কে স্থায়ী আসন দিতে হলে এই সংখ্যা অন্তত এক হাজারে নিয়ে যেতে হবে।

এরপরে শুরু হয় বহু প্রতীক্ষিত পুরস্কার প্রদান পর্ব। আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের পক্ষ থেকে এ বছর দীর্ঘ মননচর্চার সাপেক্ষে শহীদুল্লাহ পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন ইতিহাসবিদ খাজিম আহমেদ, সাহিত্য চর্চার প্রেক্ষিতে মশাররফ পুরস্কার পেয়েছেন সৈয়দ রেজাউল করিম এবং রোকেয়া পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে বিশিষ্ট সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুমিতা দাস মহাশয়াকে।

সংসদের সভাপতি অধ্যাপক আমজাদ হোসেনের পৌরোহিত্যে পুরস্কার প্রাপকদের উত্তরীয় পরিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন, মানপত্র পাঠ, মানপত্র ও সংসদ প্রকাশিত পুস্তক সহ সম্মাননা-অর্থ (৫০০০/-) তুলে দেওয়া প্রভৃতি করণীয় কৃত্য সম্পন্ন করা হয়। পুরস্কার প্রদানে অংশগ্রহণ করেন মীরাতুন নাহার, আহমদ হাসান ইমরান, বাসুদেব বিশ্বাস, এমদাদুল হক নূর, মহিউদ্দিন সরকার, মীর রেজাউল করিম প্রমুখ। মানপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক সাইফুল্লাহ এবং সুরাইয়া পারভিন।

পুরস্কার প্রাপকগণ তাঁদের বক্তব্যে আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, বর্তমানে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত সংকীর্ণতা, বিচ্ছিন্নতা এবং গতিহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এখন বিপন্নতার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে যা সার্বিকভাবে আগামী প্রজন্মের জন্য যথেষ্ট আশঙ্কার বিষয়। একমাত্র সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার প্রসারই পারে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের মধ্যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপক বক্তব্যের পাশাপাশি আগামী দিনের জন্য বিভিন্ন পরামর্শ তুলে ধরেন আহমদ হাসান ইমরান, মীরাতুন নাহার, ইমদাদুল হক নুর, বাসুদেব দাস, মহিউদ্দিন সরকার, সুরঞ্জন মিদ্দে, সিরাজুল ইসলাম, মুজিবর রহমান, আব্দুর রব খান, শতাব্দী দাস প্রমুখ।

স্মরণ-সভা

২৬ মার্চ, রবিবার প্রয়াত চিন্তাবিদ অধ্যাপক ওসমান গণি-র স্মরণে স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত গনি-পরিবারের সদস্য সহ সমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সভায় অংশ গ্রহণ ও স্মৃতিচারণা করেন। কথা হয়, 'স্মরণ আব্দুর রাউফ' এর অনুসরণে 'স্মরণ ওসমান গনি' শীর্ষক গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্যোগী হতে হবে। উল্লেখ্য, রমজান মাস চলতে থাকায় মাঝে অনেক দিন অনলাইন আলোচনাসভা বন্ধ ছিল।

পত্রিকা

মার্চ ২০২৩ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। মুদ্রণ সংখ্যা পাঁচ শত।

আয়-ব্যয় ২০২৩ (১ জানুয়ারি থেকে ৮ মে)

আয়

সদস্য চাঁদা : ৫৫০০০/-
বিশেষ অনুদান : ৪৮০০০/-
যাকাত : ৭০০০/-
বই বিক্রি : ১২৩০/-
মোট : ১,১১,২৩০/-

ব্যয়

বিল-প্যাড : ৩৯০০/-
ব্যাগ : ২৯০০/-
স্মরণসভা : ১৩০০০/-
স্মরণ আবদুর রাউফ :১৩৫০০/-
পত্রিকা : ৭৫০০০/-
বার্ষিক সাধারণ সভা : ২৮৫০০/-
ঈদ মিলন : ৭০০০/-
ডাকখরচা : ১৫০০/-
আনুষঙ্গিক : ৫০০/-
মোট : ১,৪৫,৮০০/-

ঘাটতি : ৩৪,৫৭০/-

আয় এর বিস্তৃত বিবরণ

বিশেষ অনুদান : ৪৮০০০/-
আব্দুস সামাদ (কল্যাণী সীড ফার্ম, হুগলি) : ২০,০০০/-
মহিউদ্দিন সরকার (অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক) : ১০,০০০/-
হাবিবুর রহমান (এক্সপ্রো ল্যাব, কলকাতা) : ১০,০০০/-
আলিমুজ্জমান (শিক্ষক, বহরমপুর) : ৫,০০০/-

মুহাম্মদ আফসার আলি (অধ্যক্ষ, শহীদ নুরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়) : ৪০০০/-
শেখ কামালউদ্দিন (অধ্যক্ষ, হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়) : ২০০০/-
সুমিতা দাস : ৫০০০/- (রোকেয়া পুরস্কার প্রাপক; তিনি তাঁর পুরস্কার মূল্য আলিয়া-সংসদকে দান করেন)
আনোয়ার সাদাত হালদার (সহকারী অধ্যাপক, সাগর দত্ত হসপিটাল) : ২,০০০/-
ইসমাইল দরবেশ : ৫০০০/-
জাহির আব্বাস : ২০০০/-
যাকাত : ৭০০০/-
সদস্য চাঁদা : ৫৬৫০০/-

প্রকাশনা সদস্য ও উজ্জীবন সদস্য

(১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ৮ মে ২০২৩ পর্যন্ত)

আজিজ লস্কর : গবেষক, আলিয়া, ৫০০/-
অনীক বিশ্বাস : হাওড়া, ৫০০/-
অচিন্ত্য সাহা : কৃষ্ণনগর, ৫০০/-
অরিন্দম বসু : কালিন্দি, কলকাতা, ৫০০/-
আজিজুল সেখ : কোচবিহার, ৫০০/-
আনোয়ার সাদাত হালদার : হুগলি, ১০০০/-
আবু সালেহ মুহম্মদ কাসেম : উত্তর ২৪ পরগনা, ৫০০/-
আব্দুল বারি : বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, ১০০০/-
আব্দুল মান্নান : সাহিত্যিক, কলকাতা, ১০০০/-
আব্দুস সামাদ : হাসনাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, ৫০০/-
আব্বাস আলি : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ৫০০/-
আমজাদ হোসেন : অধ্যাপক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১০০০/
আমিনুল ইসলাম : বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, ৫০০-
আমীরুল ইসলাম : দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, ১০০০/-
আলিমুজ্জমান :বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১০০০/-
আসলিম সেখ : অধ্যাপক, মুর্শিদাবাদ, ১০০০/-
ইনাস উদ্দীন : বেলগাছিয়া, কলকাতা, ১০০০/-
ইফতিকার হোসেন : বহরমপুর, ৫০০/-
ইসমাইল দরবেশ : হাওড়া, ১০০০/-
এমদাদ হোসেন : অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১০০০/
উজ্জ্বল মণ্ডল : কলকাতা, ১০০০/-
ওয়ারেসিন এ বি আমিন : উত্তর ২৪ পরগনা, ১০০০/-
কদবানু খাতুন : বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ, ৫০০/-
কামরুননাহার : আমডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৫০০/-
কাসিফুর রহমান : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৫০০/-
গোলাম কিবরিয়া : সেখপাড়া, মুর্শিদাবাদ, ৫০০/-
গোলাম মোর্তজা : সেখপাড়া, মুর্শিদাবাদ, ৫০০/-
গোলাম মুতর্জা : হরিশচন্দ্রপুর, মালদা, ৫০০/-
চিরঞ্জীব সরকার : নিউটাউন, কলকাতা, ৫০০/-
জাহির আব্বাস : অধ্যাপক, বর্ধমান, ১০০০/-
তজিবুর রহমান : হরিশচন্দ্রপুর, মালদা, ১০০০/-
তনুজা বেগম : বহরমপুর, ৫০০/-
তহিদুল ইসলাম : অধ্যাপক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ৫০০/-
নজরুল ইসলাম : বাঁকুড়া, ১০০০/-
নজরুল হক : কৃষ্ণনগর, ৫০০/-
নুপুর মণ্ডল : অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ৫০০/-
নিরুপম মণ্ডল : অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ৫০০/-
পল্লবী রায় : কলকাতা, ৫০০/-
পরিতোষ কর্মকার : মুর্শিদাবাদ, ৫০০/-
ফজলুল হক : সাহিত্যিক, বীরভূম, ১০০০/-
বাকিবিল্লাহ লস্কর : সংগ্রামপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৫০০/-
বাবলু মণ্ডল : বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৫০০/-
মইদুল : সংগ্রামপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৫০০/-
মইনুল হাসান : সংগ্রামপুর, ৫০০/-
মতিবুর রহমান লস্কর : সংগ্রামপুর, ৫০০/-
মহিউদ্দিন সরকার : বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১০০০
মাহমুদুল হক: ৫০০/-
মিজানুর রহমান লস্কর : সংগ্রামপুর, ৫০০/-
মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় : কলকাতা, ৫০০/-
মীর রেজাউল করিম : আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১০০০/-
মুহম্মদ আফসার আলী : শহীদ নুরুল ইসলাম কলেজ, ১০০০/
মুহম্মদ ইব্রাহিম : শিক্ষক, মালদা, ১০০০/-
মুহম্মদ সাহাবুদ্দিন : আমডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৫০০/-
মুহম্মদ হাবিব : কলকাতা, ১০০০/-
মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার : বীরভূম, ১০০০/-
মেহেদি হাসান গাজী : কালিকাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৫০০/
মোর্তজা নেগাবান : শিক্ষক : ডায়মণ্ডহারবার, ৫০০/-
মোস্তাক আহমেদ : টালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৫০০/-
রতনকুমার নাথ : কৃষ্ণনগর, নদিয়া, ৫০০/-

রফিকুল ইসলাম : কলকাতা, ১০০০/-
রবিউল ইসলাম—অধ্যাপক, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, ১০০০/
রবিউল মণ্ডল : গুমা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৫০০/-
রমজান আলি : শিক্ষক, বর্ধমান, ১০০০/-
রমজান সেখ : বহরমপুর, ৫০০/-
রাজকুমার সেখ : বহরমপুর, ৫০০/-
রাজিফা খাতুন : কৃষ্ণনগর, নদিয়া, ১০০০/-
রেজাউল করিম : সাহিত্যিক, কলকাতা, ১০০০/-
লিটন মল্লিক : হুগলি, ৫০০/-
শাহারুখ মোল্লা : নিউটাউন, কলকাতা, ৫০০/-
সতীনাথ ভট্টাচার্য : কৃষ্ণনগর, ৫০০/-
সরিফুল ইসলাম : সংগ্রামপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,৫০০/
সাইদ সাইফুদ্দিন : বীরভূম, ১০০০/-
সাইফুল্লা : উত্তর ২৪ পরগনা ১০০০/-
সাদেরুল আমিন : শিক্ষক, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, ৫০০/
সাবানা রহমান : সংগ্রামপুর, (আজিজ লস্কর), ৫০০/
সামাউন মণ্ডল: জে এন ইউ, দিল্লি, (শামিম), ৫০০/-
সামসুল আলম : শিক্ষক, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ, ১০০০/
সামসুল হক : সন্তোষপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৫০০/-
সামসুল হালসানা : শিক্ষক, বরহমপুর, ১০০০/-
সামিম মোল্লা : (আজিজ লস্কর), ৫০০/-
সামিয়া খাতুন : কলকাতা, ৫০০/-
সারওয়ার হোসেন : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৫০০/ সৈয়দ হাসনেয়ারা : যাদবপুর, কলকাতা, ৫০০/-
হায়দার মণ্ডল : ৫০০/-

*) যারা ৫০০ টাকা দিয়েছেন তাঁরা 'উজ্জীবন সদস্য'; ১০০০ টাকা প্রদানকারীরা 'প্রকাশনা সদস্য' বলে বিবেচিত হচ্ছেন। উজ্জীবন সদস্যদের কেবল উজ্জীবন পত্রিকা সরবরাহ করা হবে। প্রকাশনা সদস্যরা উজ্জীবন পত্রিকা সহ সংসদ প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ প্রাপ্ত হবেন।

**) যাঁরা আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের অনুকূলে 'প্রকাশনা সদস্য' বা 'উজ্জীবন সদস্য' পদ গ্রহণ করেছেন এবং আগামী দিনে করবেন তাঁদের সকলকে আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ এর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। টাকা দিয়েছেন, কিন্তু এখানে নাম নেই এমন হয়ে থাকলে অবিলম্বে তা আমাদের অবগত করে অনুগ্রহ করার জন্য একান্তভাবে অনুরোধ জানাই। যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৫৬৪৩৪২৪৭১

নিবেদন

১। বার্ষিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা দিয়ে মাসিক 'উজ্জীবন' এর গ্রাহক হন। এ বিষয়ে আপনার নিকটবর্তী প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

২। আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের যাবতীয় প্রকাশনা কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত থাকার জন্য বার্ষিক ১০০০/- (এক হাজার) টাকার বিনিময়ে সার্বিক প্রকাশনা গ্রাহক হওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। এই অর্থ এমনিতে অনুদানমূলক সহায়তা হিসেবে বিবেচিত হবে; পাশাপাশি এর সাপেক্ষে সংসদ প্রকাশিত 'উজ্জীবন' সহ যাবতীয় পুস্তক উপহার হিসেবে প্রদান করা হবে; যার অর্থমূল্য হবে এক হাজার বা ততোধিক টাকা।

৩। আমাদের এই পথচলায় আপনাকে সহযাত্রী ও সহকর্মী হিসাবে পেতে চাই । অনুরোধ থাকছে, সাধারণ অনুদানের পাশাপাশি বৃহত্তর লক্ষ্য রূপায়ণের লক্ষ্যে, বিশেষত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের সাপেক্ষে আপনার দেয় যাকাতের অংশবিশেষ প্রদান করুন।

লেনদেন

A/C 31590592615
1FSC SBIN0001299
PHONEPE 7872422313
GPAY 9734662218
হোয়াটস্‌অ্যাপে (৮৬৩৭০৮৬৪৬৯) স্ক্রিন শট পাঠানোর অনুরোধ করছি
যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩৩৬১১৬৩৭, ৯৪৩২৮৮০২৪২
aliahsanskriti@gmail.com

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ প্রকাশনা

সোহরাওয়ার্দী পরিবার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার—আলিমুজ্জমান
নেপথ্য নায়ক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন—খন্দকার মাহমুদুল হাসান (জীবনীমালা-১)
মৌলবি মুজিবর রহমান ও 'দ্য মুসলমান'—মিলন দত্ত (জীবনীমালা-২)
ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী ও বাংলার নবজাগরণ—সামশুল আলম (জীবনীমালা-৩)

আমাদের কথা

উত্তাপ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। দেশজুড়ে দুর্বিষহ উত্তাপে মানুষজন হাঁসফাঁস করছে। ভাবছে কোনো মতে এই বছরটা পার করে দিলে বাঁচি। কিন্তু না, পরের বছর নতুন করে উত্তাপ রেকর্ড ছাপিয়ে যাচ্ছে। এই উত্তাপের সহনশীলতার সীমা কতটা, মানুষ আর কতদূর সহিষ্ণু হতে পারে—তার কোনো হিসেব মানুষ নিজেই করে উঠতে পারছে না।

নতুন কথা কিছু নয়। বহু দিন থেকেই জ্ঞানী গুণী মানুষেরা বলে আসছেন, প্রকৃতির উপর এইভাবে ক্রমাগত অত্যাচার করে গেলে প্রকৃতি একসময় বিরূপ হবেই; আর মানব সভ্যতার পক্ষে সেই বিরূপতা হবে ভয়াবহ। এখন আমরা সবাই জানি, সবাই বুঝি, প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে। কেউ কেউ বলছেন—প্রকৃতি শুধু আবহাওয়াকেই উত্তপ্ত করছে না, উত্তপ্ত করে তুলছে মানুষের মনকে। মানুষ সামান্য কথায় সামান্য বিষয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন — সর্বত্র তার প্রতিফলন ঘটছে। শুধু প্রতিফলন নয়, তার পালটা প্রতিফলন, তার পালটা প্রতিঘাত, সেই পাল্টার আবার পালটা—অক্টোপাসের মতো আমাদের ক্রমাগত জড়িয়ে চলেছে অসহিষ্ণুতার মারণব্যাধি। হার্ট, কিডনি, সুগার বা প্রেসার নয়, অসহিষ্ণুতাই হয়ত আগামীতে মহামারীর আকার ধারণ করতে চলেছে।

গবেষকগণ বলছেন, বাড়িতে একজন সদস্যের মাথা গরম বা ঝগড়াঝাটির প্রবণতা পুরো পরিবারকে উত্তপ্ত করে, বাড়িটি অশান্তির নীড়ে পরিণত হয়। ক্রুদ্ধ মানুষের মস্তিষ্ক থেকে নাকি একপ্রকার তরঙ্গের সৃষ্টি হয়; এক রকম নেগেটিভ ভাইব্রেশনের সৃষ্টি হয় যা আশপাশের মানুষজনের মন থেকে সুকুমার অনুভূতি গুলিকে বিনষ্ট করে দেয়। তেমনি একটি জন সমাজে অল্প কিছু মানুষের অসহিষ্ণু আচরণ, পাশের মানুষ কিংবা প্রতিবেশীর প্রতি কথায় কথায় উত্তেজিত হওয়া, অবমাননাকর আচরণ করা পুরো পরিবেশকে দূষিত করে তোলে, উত্তপ্ত করে তোলে। সারা দেশেই এখন যেন একে অপরের প্রতি ঘৃণিত বাক্য-বাণ বর্ষণ আর অসহিষ্ণুতার প্রতিযোগিতা চলছে। টিভি খুললেই অস্বাস্থ্যকর তর্ক, সেখানে যুক্তির বালাই নেই—শুধু উচ্চকণ্ঠের লড়াই; কথার পিঠে কথা দিয়ে আক্রমণ আর প্রতি আক্রমণ। তার সঙ্গে আছে আগুনে ঘিয়ের মতো ভাষণ-সর্বস্ব রাজনৈতিক নেতাদের উস্কানি — হিংসা ছড়াও ! সম্প্রীতি কক্ষনো নয়। বিভাজন চাই, আরো আরো বিভাজন ! আমরা আম জনতা তাদের কথায় নেচে উঠি, কিছু না কিছু একটা অছিলা খুঁজে নিয়ে একটা 'আমরা' বানিয়ে ফেলি—কারণ আমাদের একটা 'ওরা' দরকার হয়; একটা প্রতিপক্ষ দরকার। হোক সে বায়বীয় কিংবা কাল্পনিক; আমরা রাজপথে হুংকার দিয়ে সবরকম মিডিয়া ছয়লাপ করে দেব—ওরা সবচেয়ে ঘৃণিত প্রতিপক্ষ, ওদের সাথে কথা বলব না, দোকানে একসাথে চা খাবো না, ছেলে মেয়েদের মিশতে দেবো না, ওদের বাড়িতে এমনকি বিয়ে-শাদিতেও যাবো না।

দেশজুড়ে একটা দমবন্ধ করা বিষাক্ত আবহাওয়া। আর বিষবাষ্প কাউকে খাতির করে না। ধনী কিংবা গরিব, মূর্খ কিংবা শিক্ষিত, বাঙালি বা মারাঠি, হিন্দু কিংবা মুসলমান—সবার ফুসফুসে তার পক্ষপাতহীন অবাধ বিচরণ। অযথা অহং, ব্যক্তিগত স্বাভিমান আর ধর্মীয় স্পর্শকাতরতা সমাজের প্রতিটি স্তরে মানুষকে যেন ক্রমাগত গ্রাস করে চলেছে। এ বিষয়ে মুসলিম সমাজ যেন আরও এক কাঠি উপরে। বিশেষত এই বাংলায়। শিক্ষিত মুসলিম সমাজে নিজদের মধ্যেই ধর্ম নিয়ে হাজার রকমের তর্ক, কূটকচাল আর ঝগড়াঝাঁটির শেষ নাই। হাদিস-কোরাণে কী আছে, কী নেই তাই নিয়ে হাজার রকমের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সবাই নিজস্ব জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে অনড়। শুধু তাই নয়, ইসলামের অবমাননা হচ্ছে বলে যখন তখন একে অপরের প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রের মতো আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, সোশাল মিডিয়ার কল্যাণে উভয়পক্ষে সৈন্য-সামন্তও জুটে যাচ্ছে বিস্তর — এতোটাই উত্তাপ ! এ উত্তাপের প্রশমন ঘটাবে কে ? কোনও কি উপায় নেই ? শুধুই কি হতাশা ? হাজার হাজার বৃক্ষ রোপণ করে প্রকৃতির উত্তাপকে কমিয়ে আনা তবু সম্ভব, কিন্তু মানুষের বুকের ভিতর শিকড় প্রসারিত হতে থাকা এই বিষবৃক্ষের বাড়বাড়ন্ত রুখবে কে ?

একশো বছর আগে কাজী নজরুল ইসলাম সোচ্চারে বলেছিলেন—'যে জাত ধর্ম ঠুনকো এতো, আজ নয় কাল ভাঙবে সে তো।' যথার্থ কথা। এই বাংলায় শিক্ষিত বিচার-বোধ সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা কম নেই। তারা নিশ্চয় জানেন, বোঝেন —প্রাচীন মুনি ঋষিদের গভীর তপস্যালব্ধ জ্ঞান থেকে উৎসারিত ভারতের সনাতন ধর্ম কিংবা চৌদ্দশো বছর আগে সাম্যবাদের গরিমায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামের বনিয়াদ এতো ঠুনকো নয় যে কারো একটি দুটি অকথা-কুকথায় তা কাচের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। ইসলামের বিপন্নতা নিয়ে চিন্তিত বন্ধুজনকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার — ইসলাম তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তার কোনো বিপন্নতা নেই। বিপন্ন বরং মুসলিম সমাজ, তার শতধা বিভক্ত গোষ্ঠীবিবাদ আর অসহিষ্ণু মনোভাবের জন্য।

উজ্জীবন : প্রাপ্তিস্থান

- অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ: বুক কর্ণার, ৯৪৭৫৯৫৩৩৪৫
- করিমপুর, নদীয়া: করিমপুর পুস্তক মহল, ৯৭৩৩৮১১৮১৯
- কলকাতা : পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, অপূর্ব, নিউ লেখা, মল্লিক ব্রাদার্স, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
- কৃষ্ণনগর, নদীয়া: বইঘর, ৯৭৩২৫৪১৯৮৪
- চাঁচল, মালদা : পুথিপত্র
- ডোমকল, মুর্শিদাবাদ: রিলেশন (বুকস্টল), ৯৭৩২৬০৯২১০
- দুবরাজপুর, বীরভূম : টিচার্স কর্নার
- বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান : রমজান অ্যাকাডেমী, ৮৭৭৭৩৯৬৬৩২ বিবেকানন্দ বুক অ্যান্ড জেরক্স সেন্টার, ৯৩৭৮১৩২৬৮৭
- বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা : সাহা বুক স্টল, ৯৮৩২৮০৬৬৬৩
- বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ : বিশ্বাস বুক স্টল, ৯৮০০০০০০৪৯ আদর্শ বুক সেন্টার, ৯৪৩৪৩৯৪৪৫২
- বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা : মল্লিক গ্রাফিক্স, ৯১৬৩৪৮৬৭৬৬
- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : অন্নপূর্ণা বুক হাউস, ৯৭৮৩৭৪৪৪৯৮
- বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর : কৃষ্ণ বুক হাউস, ৯৪৩৪৩৯৪২১২
- মালদা সদর, মালদা: আদর্শ পুস্তকালয়, ৯৫৯৩৭০৬০০৭
- মালদা সদর, মালদা: পুনশ্চ, ৯১২৬৫২৩৭৫৪
- মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর : মল্লিক পুস্তক বিপণি, ৯৯৩২০৫৭৬৬৭
- শিলিগুড়ি, দার্জিলিং: ইকনমিক বুক স্টল
- সংগ্রামপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : ছাত্র সাথী, ৯৫৯৩৪৮২১৬৯
- সিউড়ি, বীরভূম : ভারত পুস্তকালয়

পূর্ব প্রকাশিত আলিয়া ও উজ্জীবন

ত্রৈমাসিক আলিয়া
জানুয়ারি ২০১৫
এপ্রিল ২০১৮ (বিশেষ বীক্ষণ—সোহারাব হোসেন)
জুলাই ২০১৮ (বিশেষ বীক্ষণ—আফসার আমেদ)
অক্টোবর ২০১৮ (বিশেষ বীক্ষণ—আমার চোখে ঈদ)
মার্চ ২০১৯ (বিশেষ বীক্ষণ—আব্দুর রাকিব)
জুন ২০১৯ (বিশেষ বীক্ষণ—ওয়ালে মুহম্মদ)

মাসিক আলিয়া
মার্চ ২০২০, আগস্ট ২০২০, সেপ্টেম্বর ২০২০, অক্টোবর ২০২০
(কোভিড ১৯ এর প্রেক্ষিতে পত্রিকা প্রকাশ ব্যাহত হয়। মার্চ ২০২০ মুদ্রিত হয়েছিল। অন্যগুলি ছিল সফট কপি)

পাক্ষিক আলিয়া
জুন, জুলাই, আগস্ট ও অক্টোবর মাসে যথাক্রমে দুটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সেপ্টেম্বরে কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি।
(পাক্ষিক আলিয়া ছিল ৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত, ৮টি করে নিবন্ধের সংকলিত রূপ। এর কোনোটি মুদ্রিত হয়নি। সবই ছিল সফট কপি।)

মাসিক উজ্জীবন
মে ২০২১, জুন ২০২১, সেপ্টেম্বর ২০২১, জানুয়ারি ২০২২, ফেব্রুয়ারি ২০২২, মার্চ ২০২২, এপ্রিল ২০২২, মে-জুন ২০২২।

* নানা কারণে আলিয়া ও উজ্জীবন এর পথচলা ব্যাহত হয়েছে।
** আলিয়া বা উজ্জীবন এর সমস্ত সফট কপি বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯

সংখ্যাসূচি

পাঠক-দর্পণ—কারিমুল চৌধুরী ১০

দৃষ্টিপাত

ধর্মের নামে এই নৃশংসতা আর কতদিন চলবে?—সাইফুল্লা ১১

ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রূপে সম্পন্ন ও সংরক্ষিত করা হোক—মীর রেজাউল করিম ১২

আজান : দিতে হবে সর্বাত্মক সহনশীলতার পরিচয়—শফিকুল হক ১৩

ইতিহাস : নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও বখতিয়ার খলজি–আমিনুল ইসলাম ১৬

রাজনীতি : দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজই বঞ্চিত কেন? রাজনৈতিক দিশা কী?—মুহাম্মদ আফসার আলী ২৮

কবিতা: ফাহিম হাসান ৩১ অমৃতাভ দে ৩২ আবদুর রউফ ৩২ ওয়াহিদা খন্দকার ৩৩

ধারাবাহিক উপন্যাস : ঘূর্ণাবর্ত—সেখ রফিকুল ইসলাম ৩৫

গল্প

ইন্তেকাল—জারিফুল হক ৪৭
ওলাবিবি—শেখ নজরুল ইসলাম ৫০

মুক্তগদ্য : দণ্ড কক্ষ–আব্দুল বারী ৫৬

ভ্রমণ : কুমারের কথা ভেসে যায় তিস্তার স্রোতে—মহম্মদ বাকীবিল্লাহ মণ্ডল ৫৯

বই-চর্চা: নজরুল-আকাশে বিচরণ—ইনাস উদ্দীন ৬৮

সাংস্কৃতিকি : হাসিবুর রহমান ৭১, গোলাম মোর্তজা ৭২

দিন যত অগ্রসর হচ্ছে, উজ্জীবন-কে ঘিরে সাধারণের মধ্যে প্রত্যাশার পারদ ততই চড়ছে। ক্রমবর্ধমান এই প্রত্যাশাকে উজ্জীবন-কর্তৃপক্ষ কতটা বাস্তবায়িত করতে পারবেন তা সময়ের নিরিখে প্রতিপন্ন হবে। সে যাই হোক, মানুষের এই যে প্রত্যাশার ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে এটা খুবই ইতিবাচক। কাফেলা- র পথচলা থেমে যাওয়ার পর আর কোনো মাসিক পত্রিকা সেই অর্থে সেভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। উজ্জীবন সেদিক থেকে সম্ভাবনাময় বই কি!

এটা মনে করলে খুবই ভুল হবে যে, একটা মাসিক পত্রিকার যা কিছু গুণাবলী থাকা বাঞ্ছনীয় তার সবই উজ্জীবন-এ বর্তমান। অনেক ঘাটতি রয়েছে। তবে সেসব ঘাটতি অতিক্রম করার সম্ভাবনাও পূর্ণমাত্রায় দৃশ্যমান। উন্নত রুচিবোধ একটা সাহিত্য পত্রিকার জন্য প্রথম ও প্রধান কথা। উজ্জীবন এ তার ছাপ আছে। প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কাব্য-কবিতা, গল্প, উপন্যাস, বঙ্গ-দর্পণ এসবই পাঠককে তৃপ্ত করে। বই বা পত্রিকা চর্চা অংশে মননশীলতায় গভীরতা রয়েছে।

আলাদা করে মার্চ ২০২৩ নিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, সূচনায় বিশ্বজিৎ রায়ের মুহম্মদ (সঃ) বিষয়ক কবিতাটি আক্ষরিক অর্থেই অসামান্য। দেশ বিদেশের অমুসলমান সমাজ সেই বহুকালাবধি তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে নবী মুহম্মদকে দেখেছেন এবং তাঁর মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রায়শ নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হয়নি। কবিতাটিতে কবির নিরপেক্ষতা আলাদা করে আমাদের ভালোলাগাকে উজ্জীবিত করে। পূর্ণা মুখোপাধ্যায়ের তীর্থঙ্কর দিলীপকুমার তথ্য-সমৃদ্ধ রচনা। রচনাটির বিশেষ গুণ পাঠযোগ্যতা। তথ্য আছে, কিন্তু তথ্যের ভারে তা ভারাক্রান্ত নয়। একজন বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে তাঁর ব্যক্তিক ও বৌদ্ধিক পরিচয় সহ সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য রূপে তুলে ধরা হয়েছে। শেখ কামালউদ্দীনের নজরুল জীবনী : তুলনামূলক আলোচনা-তে সুচারু রূপে নজরুলচর্চার ক্ষেত্রে আমাদের নানা সীমাবদ্ধতার নির্দেশিত হয়েছে। নজরুলের প্রতি লেখকের দায়বদ্ধতা ও আন্তরিকতার সুস্পষ্ট আভাস রয়েছে এখানে।

সাম্প্রদায়িকতার আগুনে দিনে দিনে আরও বেশি করে দগ্ধ হচ্ছি আমরা। এমন অবস্থার সাপেক্ষে বিলকিস বানু বিষয়ক প্রতিবেদন তাৎপর্যপূর্ণ। সমস্যার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনোরকম প্রবণতা এখানে লক্ষ্যণীয় নয়। লেখক বরং দু পা অধিক অগ্রসর হয়ে সমস্যার গভীরে ডুব দিয়েছেন এবং নিজস্ব ভাবনার জাল বিছিয়ে সম্ভাব্য সমাধানের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট দিশা দিয়েছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, এক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে কোনোরকম প্রতিক্রিয়াশীলতা লক্ষ করা যায়নি। সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে সমস্যার স্বরূপ পরিস্ফুট করেছেন।

নষ্ট আর্তনাদ ও ধোঁয়াশা গল্প দুটি সাহিত্য গুণে ঋদ্ধ। জৈবিক প্রবৃত্তি ও মানবিক মূল্যবোধের টানাপোড়েনে দগ্ধ ব্যক্তিমনের অসামান্য চিত্রণ রয়েছে পারেশা চরিত্রে। পৌরুষত্বের উত্তাপে সেভাবে তপ্ত নয় পারেশার প্রথম স্বামী তাহের। এদিকে দুরন্ত যৌন-ক্ষুধায় সতত তাড়িত হয় পারেশা। ফলত একসময় শিশুপুত্রকে ত্যাগ করে নিজামকে পতিত্বে বরণ করে নিতে বাধ্য হয় সে। কিন্তু তাতেও সঙ্গত কারণেই তার যন্ত্রণার অবসান হয় না। মাতৃহারা সন্তান মৃত্যুর হিমশীতল কোলে আশ্রয় নিলে নিজামের প্রেম-বন্ধন ছিন্ন করতে বাধ্য হয় পারেশা। এখন সেও আশ্রয় নিতে চায় মৃত সন্তানের কবরের পাশে। গল্পের মানবিক মূল্য যেমন অসমান্য শৈল্পিক মূল্যও তেমনি। চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে পারেশা অপরূপ। 'ধোঁয়াশা' তে রয়েছে অন্য মূল্যবোধের বিচ্ছুরণ। উচ্চবর্ণীয় কতিপয় যুবকের হাতে খুন হয়েছে নিম্নবর্ণীয় কন্যা দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী পার্বতী। এই খুনের একমাত্র সাক্ষী আরাফত। বর্তমানে সে প্রবল সংকটের মধ্যে। সত্য-সাক্ষ্য দিলে ক্ষমতাধর উচ্চবর্ণীয় সমাজ তার দফারফা করে দেবে; পাশাপাশি রয়েছে মৃত পার্বতী ও তার জীবিত পিতা মাতার ঐকান্তিক আবেদন; তাছাড়া বিবেকের তাড়না তো রয়েছেই। নানামুখী টানাপোড়েনে বিক্ষত আরাফত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে অবশেষে। কে বা কারা যেন তাকে অপহরণ করে। 'বঙ্গ-দর্পণ' অংশে আব্দুল বারির কলমে বাংলার গ্রাম্য জীবন অনবদ্য রূপে রূপায়িত হয়েছে।

কারিমুল চৌধুরী, বর্ধমান

দৃষ্টিপাত

ধর্মের নামে এই নৃশংসতা আর কতদিন চলবে?

সাইফুল্লা

গত ১৮ এপ্রিল দৈনিক বর্তমান-এর ভিতরের পাতায় একটি প্রতিবেদন মুদ্রিত হয়েছিল। অন্যান্য কাগজেও আগে পরে বিষয়টি হয়তো প্রকাশিত হয়ে থাকবে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছিল, গুজরাটের জনৈক দম্পতি তন্ত্রসাধনা করতো এবং সাধনার একটা পর্যায়ে এসে তারা তাদের আরাধ্যা দেবীকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে নিজেদের জীবনকেই উৎসর্গ করেছে। বৃত্তান্তটা এইরকম—ওই দম্পতি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বাড়িতে গিলোটিন ধর্মী এমন একটা যন্ত্র তৈরি করে যার দ্বারা তাদের মাথা তারা নিজেরাই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। পরম তন্ত্রসাধক ওই দম্পতি সেদিন হোমের আগুন এমন স্থলে এমন ভাবে প্রস্তুত করেছিল যাতে তাদের কর্তিত মস্তক গড়াতে গড়াতে শেষাবধি হোমের আগুনের মাঝে উপনীত ও ভস্মীভূত হতে পারে। সবটাই করা হয়েছিল অত্যন্ত সুচারু ভাবে। আগুন প্রস্তুত করার পর তারা হাঁড়িকাঠে গলা রেখে লিভারে টান দিলে ধারালো করাতের আঘাতে মুহূর্তে তাদের মাথা ধড় থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। আর এসবই করা হয়েছিল স্রেফ আরাধ্য দেবীকে আরও সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে।

বিষয়টার ভয়াবহতা ভয়ঙ্কর; বিশেষত এই একবিংশ শতাব্দীর সাপেক্ষে। দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনেক কিছুই করা যেতে পারে, কিন্তু তাই বলে এমন ভয়াবহ কাণ্ড। প্রতিবেদনের একস্থলে বলা হয়েছে, উক্ত দম্পতির দুটি ছোটো ছোটো ছেলে বর্তমান এবং একটি সুইসাইড নোটে ছেলেদের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শিদেব অনুরোধ করা হয়েছে। শিশু পুত্র দুটির সাপেক্ষে বিষয়টির ভয়াবহতা সম্ভাব্যতার সব সীমা অতিক্রম করেছে।

মনে রাখতে হবে, ঘটনাটা যে একক, বিচ্ছিন্ন বা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী তা কিন্তু একেবারেই নয়। ধর্মের নামে বা দেবদেবীর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এভাবে মানব বলির বৃত্তান্ত প্রায়শ সংবাদ মাধ্যমে উঠে আসে। এই কিছু দিন আগেও জনৈক তান্ত্রিক একটি শিশুকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে তাকে যজ্ঞের আগুনে আহুতি দিয়েছিল। বেশ কিছু দিন আগে বাগুইআটি আঞ্চলের একটি মেয়েকে তার প্রেমিক মেদিনীপুর জেলার কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে দেবতার নামে বলি দিয়েছিল। খবরে প্রকাশ, সুপরিকল্পিত ভাবেই করা হয়েছিল কাজটা। প্রেমিক-ভাবটা ছিল ছদ্মবেশ মাত্র। বলির লক্ষ্যেই ফাঁদ পাতা হয়েছিল। পুরনো দিনের সংবাদপত্রের পাতায় চোখ রাখলে নজরে পড়বে এমন অজস্র ঘটনা।

এখন প্রশ্ন, এত সব ঘটনাতো ঘটছে, কিন্তু তা নিয়ে তেমন হইচই হচ্ছে কই। কোনো কোনো ঘটনা সংবাদপাদপত্রের পাতায় একবার মুখ দেখিয়েই অন্তর্হিত হচ্ছে, কেউ তার কথা মনে রাখছে না; কোনো কোনো বিষয়কে ঘিরে দুই চারদিন সামান্য একটু কথা চলাচালি হচ্ছে মাত্র; তারপর সব যথানিয়মে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কথা হল, এমনভাবে বিষয়গুলিকে কি ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হতো যদি তা মুসলমান সমাজ আশ্রিত কোনো বিষয় হতো। অভিজ্ঞতা বলছে, সেক্ষেত্রে মুহূর্তে আলোড়িত হতো সংবাদ মাধ্যম। তখন সংবাদ মাধ্যমগুলির এ বলতো আমায় দেখ, ও বলতো আমায় দেখ। আর তাদের সম্মিলিত সাধনে 'গুষ্টির তুষ্টি' করা হত ইসলাম ধর্মের, বিশেষত মুসলমান সমাজের। কিন্তু কেন এমন দ্বিচারিতা?

সংবাদ মাধ্যমের একটা নিজস্ব স্বভাব আছে। জনগণের ইচ্ছার বাইরে গিয়ে তারা বিশেষ কিছু করে না; করতে পারে না। মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা তাদের চাহিদাকে মূলধন করে তাদের যা কিছু করবার তা করতে হয়। এর অতিরিক্ত কিছু করতে গেলে অস্তিত্বের সংকট তৈরি হতে পারে। কাজেই তাদের বিষয়ে আলাদা করে কিছু নাই বা বলা হল। কিন্তু যাদের তেমন কোনো দায় নেই তাদের জন্য কী বলা হবে? কী বলবেন এক্ষেত্রে তথাকথিত সুশীল সমাজের সদস্যরা আত্মপক্ষসমর্থন করে? এতসব মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরেও কী তারা সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থাকবেন; চোখে ঠুলি পরে, কোনো কিছুই না দেখার ভাণ করবেন?

কোনো একটা বিষয়কে দেখা বা না দেখা; নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা, এসব অবশ্যই ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধিকারের বিষয়; তা নিয়ে আলাদা করে কিছু না বলাই শ্রেয়। কিন্তু সমস্যা হয়, এই স্বাধিকারের সঙ্গে যখন জাতি, ধর্ম, বর্ণ এসব বিষয় জড়িয়ে যায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতির সাপেক্ষে সুশীল সমাজের ক্রিয়াশীলতা, অতিসক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা মোটেই শুভচেতনার পরিচয় নয়। আমাদের সুশীল সমাজ যত দ্রুত এক্ষেত্রে শুভচেতনার পাঠ গ্রহণ করতে পারেন ততই মঙ্গল।

দৃষ্টিপাত

ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রূপে সম্পন্ন ও সংরক্ষিত করা হোক

মীর রেজাউল করিম

বিষয়টি ক্রমশ স্বাভাবিকতার সীমা ছাড়াচ্ছে। ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। বেশ কিছু দিন আগে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়ন্ত্রাধীন ইংরেজি মাধ্যম সরকারি মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দেখা গেছিল চাকরিপ্রর্থীরা তাদের সম্পূর্ণ শিক্ষার্থী-জীবনে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে এবং লিখিত পরীক্ষাতেও অনুরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে; তবু তারপরেও তাদেরকে চাকুরিতে বহাল করা হয়নি, শুধুমাত্র ভালো ইন্টারভিউ দিতে না পারার ধুয়ো তুলে। শূন্যপদ ছিল হয়তো ৭টি। ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল হয়তো ১২ জনের। তার মধ্যে মাত্র ১ জনকে মনোনীত করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট শূন্যপদগুলিকে শূন্যই রেখে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি গভীর সন্দেহের উদ্রেক করে। বিশেষত এই ঘটনা যখন বিশেষ করে সংখ্যালঘু সমাজের কর্মপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। অভিযোগ রয়েছে ডাবলু বি সি এস-এ লিখিত পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করার পরেও কেবলমাত্র মৌখিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউতে ন্যূনতম নম্বর না পাওয়ার জন্য তাদেরকে চাকুরি দেওয়া হয়নি। কথা উঠছে, তারা সত্যিই ন্যূনতম নম্বর পায়নি, না তাদেরকে তা দেওয়া হয়নি? আমাদের কিন্তু দ্বিতীয় সম্ভাবনাকেই বাস্তব বলে মনে হচ্ছে। কেননা পি এস সি মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে বলে শোনা গেছে, যেখানে মোট শূন্যপদ ছিল ৫টি, প্রার্থী ছিল হয়তো ১০ জন; এর মধ্যে ১ জন অমুসলিম, বাকিরা মুসলিম সম্প্রদায়ের। ফল প্রকাশের পর দেখা গেছে ২ জনকে মাত্র চূড়ান্ত তালিকায় রাখা হয়েছে এবং তার মধ্যে ওই অমুসলিম প্রার্থী রয়েছে। কেবল ইন্টারভিউ এ উপযুক্ত দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি এমন ধুয়ো তুলে এতগুলি পদকে শূন্যই রেখে দেওয়া হল! বিষয়টি ভয়ঙ্কর এক সন্দেহকে ধারণ করে বই কি!

যদি এমন হয় এক বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে এইসব কর্মপ্রার্থীকে তবে তার থেকে বেশি খারাপ কী হতে পারে আমাদের জানা নেই। শিক্ষার্থী জীবনে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এতটা পথ পাড়ি দেওয়ার পর শুধু ধর্ম-পরিচয়ের প্রেক্ষিতে যদি এমন পরিণতির শিকার হতে হয় তবে তো দাঁড়াবার আর কোনো জায়গা থাকে না। মনে রাখতে হবে, এটা ঘটছে স্কুল বা অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নয়, মাদ্রাসায়; অর্থাৎ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমাজের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক মনোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। কতটা অসুস্থ চেতনা দেহমনে ধারণ করে ইন্টারভিউ নিতে বসলে এমনটা করা যায় তা সহজেই অনুমেয়। যদি ধরেই নেওয়া হয়, এরা সত্যিই উপযুক্ত দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি, তারপরেও কিন্তু কথা থেকে যায়। পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধান স্বীকৃত। এমনভাবে ইন্টারভিউ এর নাম করে পিছিয়ে পড়া সমাজের কর্মপ্রার্থীদের বঞ্চিত করা হলে যে সংবিধানের মৌলসত্যকেই অস্বীকার করা হয়।

সমস্যা রয়েছে ও বি সি-এ পদে নিয়োগ বা ভর্তির ক্ষেত্রেও। প্রায়শ দেখা যাচ্ছে, উপযুক্ত দক্ষতা সম্পন্ন প্রার্থী পাওয়া যায়নি, এই কথা বলে শূন্য রেখে দেওয়া হচ্ছে ও বি সি-এ অর্থাৎ মুখ্যত মুসলমান সমাজের জন্য সংরক্ষিত পদগুলি। সবমিলিয়ে সব দিক থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে মুসলমান সমাজকে। তার চেয়েও মারাত্মক, যারা এটা করছেন তারা ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পরে রীতিমতো ভণ্ডামি করছেন।

কোনো সন্দেহ নেই, এর মূলে রয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অলিন্দে রাজ করা বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণির কায়েমী স্বার্থ। এর থেকে সহজে কারও মুক্তি নেই। ওরাই নিয়ম কানুন তৈরি করে এবং ওই নিয়মের হাঁড়িকাঠে রেখে বলি দেয় অন্যদের। তবু তারমধ্যেও যথাসম্ভব সচেষ্ট হতে হবে। প্রথমেই দাবি তুলতে হবে, প্রত্যেক ইন্টারভিউ বোর্ডে কমপক্ষে একজন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমাজের প্রতিনিধি রাখতে হবে। সংখ্যালঘু সমাজের একজন প্রতিনিধিকে সাক্ষী করে তার সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের বঞ্চনা করা তুলনামূলকভাবে কঠিন হওয়া স্বাভাবিক। জোরদার দাবি তুলতে হবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে আন্দোলন। সর্বোপরি, প্রত্যেক ইন্টারভিউ প্রক্রিয়াকে দর্শন ও শ্রবণ গ্রাহ্য রূপে রেকর্ড করে তা সংরক্ষিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তেমন হলে প্রয়োজন মতো আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে।

দৃষ্টিপাত

আজান : দিতে হবে সর্বাত্মক সহনশীলতার পরিচয়

শফিকুল হক

রমজানের প্রাক্‌কালে মসজিদে আজান, নামাজ ও ওয়াজ নসিহতের ক্ষেত্রে মাইকের ব্যবহার নিয়ে সৌদি আরবে সম্প্রতি যে বিধিনিষেধে আরোপিত হয়েছে তাতে সারা বিশ্বের মুসলিম মহল আলোড়িত। সৌদি প্রশাসন নির্দেশিকা জারি করেছে, যে মসজিদে লাউডস্পিকারে আজানের শব্দ কমিয়ে তিন ভাগের এক ভাগে নামিয়ে আনতে হবে, আজান ও একামত ছাড়া নামাজ বা কোরআন তেলাওয়াত মাইকে সম্প্রচার করা যাবে না, তার শব্দ মসজিদের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। প্রত্যাশিত ভাবেই দেশে-বিদেশে ধর্মপ্রাণ মুসলিম এবং উলেমাগণ ভীষণ ক্ষুব্ধ। পবিত্র মক্কা-মদিনার দেশ খোদ আরবের ভুমিতে যদি এরকম ইসলামের অমর্যাদাকর বিধিনিষেধ জারি করা হয় তাহলে বিশ্বের অন্যান্য দেশে ইসলামের মর্যাদার উপর বড়ো আঘাত নেমে আসার ঘটনা বাড়তে থাকবে। ক্ষমতায় আসার পর থেকে সৌদি যুবরাজ সালমান আধুনিকতার নামে, সংস্কারের নামে, একের পর এক ইসলাম বিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন। গানবাজনা, খেলাধুলা, সিনেমা, মেয়েদের খেয়াল খুশিমতো চলাফেরা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ক্রমাগত এমন এমন ঘোষণা তিনি দিয়ে চলেছেন যা এযাবৎ প্রতিপালিত ইসলামি শরিয়া ও সংস্কৃতিকে ওলটপালট করে দিচ্ছে। পবিত্র আরব ভূমির পবিত্রতা আজ সংকটের মুখে। খোদ আরব ভুমিতেও উলেমাগণ নানাভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।

মসজিদের আজানে লাউডস্পীকারের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক যে এই প্রথম তা নয়, সৌদি প্রশাসন দু'বছর আগেই (মে, ২০২১) মসজিদের মাইকে আজানের শব্দ কমিয়ে রাখার নির্দেশিকা জারি করেছিলেন। এর পক্ষে ব্যাখ্যা দিয়ে আরবের ধর্মমন্ত্রী আব্দুল লতিফ আল শেখ বলেছিলেন, যে কাছাকাছি একাধিক মসজিদে একত্রে উচ্চস্বরে আজানের শব্দ বয়স্ক ও অসুস্থদের অসুবিধা সৃষ্টি করে, শিশুদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। এই নিয়ে সাধারণ মানুষের অনেক অভিযোগ আছে। তাছাড়া হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন—যারা নামাজ পড়তে চান তাদের ইমামের ডাকের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না, আগেভাগেই তারা মসজিদে হাজির হয়ে যান।

ভারতবর্ষে এমনিতেই মাইকে আজান নিয়ে বিতর্ক অনেকদিন ধরে চলে আসছে। সৌদি আরবের ঘোষণার পর থেকে সে বিতর্কের পালে নতুন করে হাওয়া লেগেছে। প্রতিবেশী বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি মুসলিম অধ্যুষিত দেশেও এই বিতর্ক মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আর সে বিতর্ককে নিছক উলেমাদের বিক্ষোভ কিংবা ভারতবর্ষে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের বিদ্বেষজাত ঝামেলা পাকানো বলে ধরে নিয়ে উদাসীন দৃষ্টিতে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলে বড্ডই ভুল হবে। বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে বহু সাধারণ মানুষ এই বিতর্কে অংশ নিয়ে পক্ষে বা বিপক্ষে এমন সব মন্তব্য ও মতামত প্রকাশ করছেন যে তার ফলে বিতর্কের মূল জায়গাটিই দূরে সরে যাচ্ছে। সেই জায়গায় সৃষ্টি হয়ে চলেছে এক চূড়ান্ত ধর্মীয় উন্মাদনা এবং অন্ধ আবেগজনিত অসহিষ্ণুতার পরিবেশ যা যখন তখন ঝুটঝামেলা, হিংসা, মারামারি, এমনকি উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে। সৌদি প্রশাসনের এই নির্দেশিকা কতটা ইসলাম সম্মত এবং কতটা যুক্তিসঙ্গত তা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বিচার বিবেচনা বা বিশ্লেষণধর্মী কোনও আলোচনা চোখে পড়ছে না, উল্টে মুসলিম সমাজের ভিতরেই সৃষ্টি হচ্ছে নানারকম বিবাদ, হিংসাত্মক ঝুটঝামেলা।

এই সময়ের সবচেয়ে বড় এবং জ্বলন্ত সমস্যা হচ্ছে অসহিষ্ণুতা। জাতি, ধর্ম, ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক পরিবেশ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে অসহিষ্ণুতার মাত্রা যেন টগবগিয়ে বেড়ে চলেছে। একুশ শতকে কম্পিউটার

আর মোবাইল নির্ভর দ্রুত ধাবমান প্রযুক্তি-সভ্যতার কুফল ইত্যাদি ব্যাখ্যা মনস্তত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিদগণ যাই হাজির করুন না কেন, বাস্তব হচ্ছে এখন আমাদের যেকোনো বিষয়ে ভিন্ন কথা শোনার মতো ধৈর্য কম, ভাবার মতো ইচ্ছে ও সময় কোনটাই নেই। অগ্রপপশ্চাৎ বিবেচনা ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে যে কোনো একটা পক্ষ নিয়ে আমরা উত্তেজিত হয়ে পড়ছি। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের একটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করি। মাস কয়েক আগে চট্টগ্রামের নাদের খান নামে একজন শিল্পপতি, জনকল্যাণ মূলক কাজকর্মেও এলাকায় তার কিছু সুনাম আছে, তিনি স্থানীয় মসজিদ কমিটির সেক্রেটারিকে মসজিদে মাইকের ব্যবহার কমানোর অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন। সৌদি প্রশাসনের মতোই যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন, যে আশেপাশে আট-ন'টি মসজিদ থেকে একসঙ্গে যখন আজান দেওয়া হয় তখন তা আর সুমধুর থাকে না, বরং অস্পষ্ট একটা বিকট আওয়াজে পরিণত হয়। এছাড়া তারাবির নামাজ, অন্যান্য ওয়াজ নসিহত মসজিদ থেকে মাইকে সম্প্রচার চলতে থাকে। ক্রমাগত মাইকের এই আওয়াজে বয়স্ক, শিশু ও অসুস্থদের ঘুমের ব্যাঘ্যাত ঘটে, শিক্ষার্থীদের পড়াশুনায় অসুবিধা হয়। তাছাড়া ভিন্নধর্মী মানুষদের কাছেও বিষয়টি বিরক্তিকর হয়। সুতরাং আজানের আওয়াজ কমিয়ে দেওয়া হোক এবং অন্যান্য সম্প্রচার মসজিদের ভেতরেই সীমাবদ্ধ রাখা হোক। এই চিঠি পরে সমাজ-মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিগত স্তরে নাদের খানের পরিবার ধর্মপ্রাণ বলেই পরিচিত। তাঁর স্ত্রী নিজস্ব উদ্যোগে আশপাশের রাস্তায় সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন দেওয়ালে হাদিস-কোরআনের বাণী সুন্দর করে লিখে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। তা সত্ত্বেও সাধারণ জনতার পক্ষ থেকে গালিগালাজ, 'কেমন মুসলমান যে আজান বন্ধ করতে বলে? চারিপাশে যে বক্স বাজিয়ে গানবাজনা চলে তার বেলা? ওকে দেশছাড়া করে ইন্ডিয়াতে পাঠিয়ে দাও' ইত্যাদি মন্তব্য আর আক্রমণের হুমকি বেড়েই চলেছে। থানায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগও দায়ের হয়েছে। পুলিশকে মীমাংসার জন্য হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে। বিশদে না গিয়েও একটা বিষয় লক্ষণীয়—নাদের খানের আবেদন ও বক্তব্যকে ঠাণ্ডা মাথায় যুক্তি দিয়ে বিচার করার সহনশীলতাটুকু না দেখিয়ে বিক্ষুব্ধ মানুষ তাৎক্ষণিক আবেগে ক্রোধান্বিত হয়ে ক্ষোভের প্রকাশ করে চলেছেন। তিনি আজান বন্ধ করা কিংবা ওয়াজ নসিহতের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নি। সৌদি আরবের মতোই শুধু আওয়াজ কমানো এবং অন্যান্য সম্প্রচার মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু আলেম-মাওলানাগণ বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে নাদের খানকে আজান বিরোধী, ইসলাম বিরোধী তকমা দিয়ে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করছেন। গণমাধ্যমে সেসব ভাষণ ছড়িয়ে পড়ছে, সাধারণ মানুষ আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। এই অসহিষ্ণুতা নিশ্চই সুস্থ সমাজের জন্য কাম্য হতে পারে না। মসজিদ কমিটি এবং ধর্মীয় নেতৃবর্গের কাছ থেকে বরং আরেকটু সংযত ও শান্তিপূর্ণ আচরণই প্রত্যাশিত ছিল। ধর্মীয় কারণে বা বৃহত্তর স্বার্থে সেসব অনুরোধ রক্ষা করা যদি সম্ভব না হয়, সেটাও সবিনয়ে জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তেমন জরুরি মনে হলে, বৃহত্তর স্বার্থে কিছু শিক্ষার্থীর বা কিছু শিশুর অসুবিধাকে উপেক্ষা করাও যেতে পারে। সেই প্রত্যাখ্যানও রুচিপূর্ণ ভাবে করা সম্ভব। সেটাই সম্ভবত প্রকৃত ধর্মীয় সহনশীলতা।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ভারতবর্ষে আজান সংক্রান্ত বিবাদ বহুদিনের। হাল আমলে এ নিয়ে হুমকি, সমালোচনা, মামলা, মোকদ্দমা নিয়ে প্রায়শই গণমাধ্যম সরগরম হয়ে ওঠে। সবাই বোঝে ভারতে আজানে লাউডস্পিকারের ব্যবহার নিয়ে আক্রমণ আসে মূলত উগ্র হিন্দুত্ববাদী মানুষজন বা সংগঠনের পক্ষ থেকে। বলা বাহুল্য, যুক্তি অপেক্ষা ধর্মীয় বিদ্বেষই এইসব অভিযোগের মুখ্য কারণ সেটাও সবাই বোঝে। কিন্তু তার বাইরেও কি ভাবার মতো কিছু যুক্তিগ্রাহ্য বিষয় নেই? কলকাতা শহরে কলুটোলা, তালতলা, পার্ক সার্কাস, বেলগাছিয়া প্রভৃতি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা গুলিতে ঘনবসতির কারণে ৫০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে পাঁচ-সাতটি কি তারও বেশি মসজিদ আছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় প্রতিটি মসজিদ থেকে লাউডস্পিকারে যে আজান দেওয়া হয়—অস্বীকার করার উপায় নাই যে একেকটা মসজিদে পাঁচ-সাতটা স্পিকার, প্রত্যেক মুয়াজ্জিনের আজানের কণ্ঠ ও সুর ভিন্ন ভিন্ন, সব মিলিয়ে একত্রে যে আওয়াজের সৃষ্টি হয় তা মোটেও শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে না। আজানের বাক্যগুলিও একটার সাথে আরেকটা জড়িয়ে পড়ে। ফলে আজানের জবাব দেওয়াতেও জটিলতার সৃষ্টি হয়। আবেগে উত্তেজিত না হয়ে আমরা যদি একটু ভেবে দেখি— স্বল্পদূরত্বের মধ্যে সব মসজিদেই কি লাউড স্পিকারের প্রয়োজন আছে? প্রতিটি ওয়াক্তে মুয়াজ্জিনের মাধ্যমে নামাজের আহ্বান সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তো আজানের উদ্দেশ্য। ঘন বসতি এলাকায় যেকোনো একটা মসজিদে মাইকের ব্যবস্থা থাকলেই পুরো মহল্লায় আজানের আহ্বান পৌঁছে যেতে পারে। এছাড়া অনেক জায়গায় দেখা যায় রমজান মাসে পুরো তারাবির নামাজ মাইকে সম্প্রচার হয়। আমি

ব্যক্তিগতভাবে একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বাস করি যেখানে একটি পাড়ার ভেতরেই চার-পাঁচটি মসজিদ আছে, প্রতিটিতেই মাইকে আজান দেওয়া হয়। এর মধ্যে একাধিক মসজিদে খতম তারাবির নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং সে নামাজ প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে লাউডস্পিকারে সম্প্রচারিত হয়। এটা কি খুবই জরুরী? কাছাকাছি বসবাসকারী অমুসলিমদের মনে এর ফলে একটা বিরক্তি আর বিরাগ সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। খুব জরুরি না হলে অকারণ ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিরাগ আর বিরক্তি সৃষ্টি হোক সেটা নিশ্চয় কেউ চাইব না আমরা। আর অমুসলিম কেন, এলাকার মুসলিমদের মধ্যেও একটা অসহায়তার প্রকাশ দেখা যায় — মসজিদে যতক্ষণ তারাবি চলে ততক্ষণ বাড়ির মেয়েরা নামাজ পড়তে দাঁড়ায় না, কারণ মসজিদের নামাজ আর দোয়া-দরুদের দিকেই মনোযোগ চলে যায়।

ভারতবর্ষে এ নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ ও বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমার কথা সবাই জানে। সোনু নিগমের মন্তব্য নিয়ে সমাজ মাধ্যমে তোলপাড় হওয়া এবং সোনুর নিজের মাথা মুড়িয়ে ফেলার কাহিনি এখনো টাটকা। মহারাষ্ট্রে নবনির্মাণ সেনার পক্ষ থেকে আজানের সময় হনুমান চাল্লিশা পাঠ করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। গত বছর বেঙ্গালুরুতে আর চন্দ্র শেখরণ নামে একজন আজান বন্ধের দাবিতে মামলা দায়ের করেছিলেন। কর্নাটক হাইকোর্ট যদিও আবেদন করা মামলাটি খারিজ করে দিয়েছেন, তবু বেঙ্গালুরু মসজিদ কমিটি এই দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়ে মাইকের শব্দসীমা কমিয়ে দিয়েছিলেন। শব্দসীমা প্রসঙ্গে কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতি সাহেবের মামলার কথা স্মরণ করা যায়। ১৯৯৬ সালে তিনি আজান প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শব্দদূষণ বিধির বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন, কিন্তু সে মামলা খারিজ হয়ে যায়। বরকতি সাহেব সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছিলেন, কিন্তু সেখানেও সে মামলা গৃহীত হয়নি। যদিও এযাবৎ সরকারিভাবে আজানের শব্দসীমা নিয়ে বিশেষ হইচই হয়নি, কিন্তু যেটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তা হলো, গত বছর এই প্রসঙ্গে ইমাম বরকতি সাহেবের মন্তব্য। একটি আলোচনায় তিনি নিজেই উল্লেখ করেন যে ইসলামের বিধান হলো নামাজের আগে আজান দিয়ে মানুষকে জানানো। সেটি মাইকেই বলতে হবে সেরকম কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

কোথাও কম কোথাও বেশি, ভারতবর্ষে মসজিদে লাউড স্পীকারে আজান নিয়ে খুচখাচ তর্কবিতর্ক লেগেই আছে। সাম্প্রতিক কালের আর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করি। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সঙ্গীতা শ্রীবাস্তব গত বছর রমজান মাসে জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ করেন যে, ভোর চারটে থেকে সেহরির জন্য বারবার মসজিদের মাইকে ডাকাডাকিতে তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। জেলাশাসক এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মসজিদ কর্তৃপক্ষ সেটি মেনে নিয়ে মিনার থেকে দুটি স্পিকার খুলে নেন এবং আওয়াজের মাত্রাও অর্ধেক করে দেন। অর্থাৎ আজান, নামাজ সহ বিভিন্ন ধর্মীয় আচার আচরণ পালনের ক্ষেত্রে হাদিস কোরানের নিয়ম কানুন মেনেও সাধারণ মানুষের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করা যায়, সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় — শুধু প্রয়োজন একটু সহনশীল মন, একটু ধৈর্য ধরে সমস্যাগুলিকে শোনা এবং উত্তেজিত না হয়ে সেগুলি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা। ইসলামের মূল আদর্শ হিসেবে আমরা যতটুকু জানি, নিজ ধর্মীয় আচার পালন করতে গিয়ে অন্য কোনও মানুষ বা সম্প্রদায়ের অসুবিধা সৃষ্টি করা ইসলাম সমর্থন করে না। মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথাই সাহাবাগণ বলে এসেছেন। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে, শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতার যত অগ্রগতি হচ্ছে, তত যেন মুসলিম সমাজের ভিতরেই ধর্মাচরণ সংক্রান্ত ছোটো ছোটো বিষয়ে বিবাদ বিসম্বাদ বেড়ে চলেছে। কোথাও কোথাও আলেম উলেমাগণও ছোটখাটো বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছেন, সোশাল মিডিয়া বাহিত হয়ে সেসব বিতর্ক আরো বিবর্ধিত হয়ে সাধারণ মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে, অসহিষ্ণুতার প্রকাশও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তার সাথে সাথে। একটি সুস্থ সমাজের জন্য নিশ্চয় এই পরিস্থিতি কখনো কাম্য হতে পারে না। মীরাতুন নাহারের 'আজান ও মেহেরজান' গল্পটির কথা অনেকেরই হয়ত মনে আছে। যুক্তি দিয়ে তর্ক দিয়ে আইনকে আমরা হয়তো প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, কিন্তু তাতে মেহেরজানের মতো সাধারণ একটি জীবনের কষ্ট লাঘব হয় না। ধর্মীয় জীবন যাপনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবন যাপনচিত্র নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে। বর্তমানে মুসলিম সমাজে শিক্ষিত সচেতন মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে, ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে তারা সাধারণত উদাসীন থাকেন — ওসব মৌলবি মৌলানাদের ব্যাপার। কিন্তু উদাসীন থাকার মতো আর সময় নেই, তাদেরও এই বিষয়ে ভাবতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে। সার্বিকভাবে মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হবে সেরকম উদ্যোগ এবং পদক্ষেপই ইসলামের সঠিক আদর্শ। রক্ষণশীল অহং এবং নিজস্ব আবেগের উত্তেজনা দিয়ে নয় —এখন সময় এসেছে বিতর্কিত বিষয়গুলি যুক্তি ও প্রাসঙ্গিকতা দিয়ে ভাবার, বিবেচনা করার।

ইতিহাস

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও বখতিয়ার খলজি

আমিনুল ইসলাম

১

বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধবংসের জন্য বখতিয়ার খলজির নির্মম আক্রমণকে সাধারণত দায়ী করা হয়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, এ এল ব্যাসাম, রোমিলা থাপার থেকে শুরু করে ইরফান হাবিবের মত দিকপাল ঐতিহাসিকও নালন্দা ধবংসকারী হিসেবে বখতিয়ার খলজিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। ইরফান হাবিব লিখেছেন, "এই মহাবিহার ১২০০ সালে মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির নালন্দা আক্রমণ ও হত্যালীলা সহ বেশ কিছু রাজনৈতিক ঝড়ঝাপটা সামলে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত টিকেছিল।" ৪ জানুয়ারি ২০১১- এ চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের ৯৮ তম অধিবেশনে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের বক্তব্য : ১১৯৩ সালে বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে নালন্দা মারাত্মকভাবে ধবংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। (হিন্দু, ৮ জানুয়ারি ২০১১।)

এ তথ্য সর্বাংশে সত্য নয়। তবে এই আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আমরা নালন্দার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরতে পারি। বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের ভিত্তি বিশ্লেষণ করে নালন্দার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দী থেকে। তখন নালন্দা ছিল একটি সমৃদ্ধ শহর। কিন্তু নালন্দার অবস্থান নিয়ে ঐতিহাসিকেরা সহমত হতে পারেননি। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে পার্শ্ববর্তী অনেক স্থানের সঙ্গে নালন্দাকে সনাক্ত করেছেন ঐতিহাসিকেরা। কিন্তু এইসব তথ্য প্রমাণ থেকে নালন্দার সঠিক সনাক্তকরণ সহজসাধ্য নয়। কারণ অনেক তথ্যই পরস্পর বিরোধী। তবে পালি-বৌদ্ধ সাহিত্য ও জৈন উপাদান থেকে নালন্দার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সে নালন্দা এবং বর্তমান নালন্দা মোটামুটিভাবে একই, যা কিনা বিহার রাজ্যের রাজগীর শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত।

বৌদ্ধ সংঘের সংস্কৃত বা পালি প্রতিশব্দ হল বিহার, যার প্রকৃত অর্থ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আশ্রয়স্থল। এইসব বিহারের অনেকগুলি পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল, তার মধ্যে কয়েকটি আবার বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল; যেমন নালন্দা। এই নালন্দার উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। কারণ ফা-হিয়েন যখন নালন্দাতে আসেন, তখন সেখানে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। গুপ্তযুগে নালন্দা বিহার থেকে মহাবিহারে রূপান্তরিত হয়েছিল মূলত রাজকীয় অনুদানের দ্বারাই। আর কোনো মহাবিহার নালন্দার মত রাজকীয় অনুদান পায়নি। কারণ নালন্দা ছিল বিশ্বমানের শিক্ষাক্ষেত্র। পাল রাজারাও ছিলেন নালন্দার পৃষ্ঠপোষক। পাল শাসনকালেই নালন্দা খ্যাতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল। এই পাল রাজারা ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী আর নালন্দা ছিল তাঁদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র; যার ফলে তাঁরা মুক্তহস্তে নালন্দাতে দান করছিলেন। সেই সময় নালন্দাতে ভারতের বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকেও শিক্ষার্থীরা আসতো, যারা জ্ঞানার্জনের শেষে প্রচুর আর্থিক সাহায্য নালন্দাকে দিয়ে যেত—নালন্দার সমৃদ্ধির এটাও একটা অন্যতম প্রধান কারণ বলা যেতে পারে। এখানে প্রায় ১০,০০০ ছাত্র বসবাস করত ও অধ্যয়ন করত। (নালন্দা উৎখননের ফলে যে বাড়িগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দশ হাজার ছাত্রের থাকার ব্যবস্থাকে সমর্থন করা যায় না। ৬৭০ সালে ইৎ-সিং নামে অপর এক চীনা পরিব্রাজক নালন্দা পরিদর্শন করেন। তাঁর মতে, এখানে তিন হাজার ভিক্ষু থাকত। ইৎ-সিং এর বক্তব্যই বেশি সমর্থনযোগ্য ও যুক্তিসম্মত বলে মনে করেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রামশরণ

শর্মা)। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ স্বয়ং নালন্দার অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কাছে পড়াশুনো করতেন। তাঁর মতে, ভারতে তখন হাজার হাজার শিক্ষাকেন্দ্র ছিল; কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয়ের বৈচিত্র্য, শিক্ষা পদ্ধতির উৎকর্ষে ও বিশালত্বে নালন্দার স্থান ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ।

২

বখতিয়ার খলজি মগধ অঞ্চলে ধ্বংস-যজ্ঞ চালিয়েছিলেন, এর উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিকদের একাংশ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়[১] তিনিই ধ্বংস ও অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। উদন্তপুরী মহাবিহার ধ্বংসের দৃষ্টান্ত থেকেও বোধহয় নালন্দা ধ্বংসের জন্য বখতিয়ারকে দায়ী করা হয়। অনুমান নির্ভরতা ঐতিহাসিক সত্যের প্রমাণ হতে পারে না। প্রচলিত উপকথা ও জনশ্রুতির বিপরীতে এখানে বলে রাখা ভাল যে, নালন্দা মহাবিহার বখতিয়ারের বিহার অভিযানের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। নালন্দার ক্ষয়-ক্ষতিগুলো সবই প্রাক-ইসলামীয় যুগের। আর এক্ষেত্রে কয়েকবার যে অগ্নিকাণ্ড ঘটানো হয় তার প্রমাণ পোড়া চাল ও শীলমোহর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া যায়। অগ্নিকাণ্ডে বা অন্য কোনো কারণে ধ্বংস হলেও তৎকালীন রাজন্যবর্গ, বিত্তশালী লোক ও ভিক্ষুদের সহায়তায় নালন্দা কয়েকবার পুনর্গঠিত হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে সৌধগুলির তিনটি থেকে নয়টি পর্যন্ত পুনর্গঠনের স্তর পাওয়া যায়। দেখা যায়, প্রতিবারই পূর্বের স্থাপত্যকর্মের ধ্বংসাবশেষের উপরই পুনর্নির্মিত ভবনগুলি গড়ে উঠেছে।

তবে কৌতূহলোদ্দীপক ঐতিহাসিক তথ্য হল এই যে, নালন্দা ধ্বংসের দায় বখতিয়ারের উপর চাপানো হলেও তিনি কিন্তু নালন্দাতেই যাননি। তাহলে এই অপবাদ কেন? মূল লক্ষ্য হল, ভারতে মুসলিম শাসন কতটা অসুন্দর ছিল তা প্রতিপন্ন করা। প্রচারণা এমনই যে, বখতিয়ার খলজি কতটা বর্বর হলে বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের মতো এমন একটি জঘন্য কাজ করতে পারেন, গ্রন্থরাজিতে আগুন লাগিয়ে দিতে পারেন! একই সঙ্গে এই বক্তব্যে আরও রং চড়িয়ে বলা হয়, যে মুসলিম শাসনের নিপীড়ন-অত্যাচারে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের আপাত অবলুপ্তি ঘটে। অথচ এমন বক্তব্য যে মিথ্যা ও প্রতারণাপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।[২] বোঝাই যাচ্ছে, উদন্তপুরীকে ভুলে নালন্দা ভেবে ফেলা হয়েছে। বখতিয়ার নালন্দাতে যাননি।[৩] তিনি অভিযান চালিয়েছেন উদন্তপুরে, কেননা এটাই ছিল সেসময়ের রাজধানী।

ঐতিহাসিক কে কে কানুনগো 'জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল'-এ প্রকাশিত শরৎচন্দ্র দাশের 'অ্যান্টিকুইটি অফ চিটাগাঁও' প্রবন্ধ থেকে জানাচ্ছেন, যে কাশ্মীরের বৌদ্ধ পণ্ডিত শাক্য শ্রীভদ্র ১২০০ সালে মগধে গিয়ে দেখেছিলেন বিক্রমশীলা ও উদন্তপুরী বিহার ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তুর্কিদের ভয়ে শ্রীভদ্র ও ওই বিহার দুটির ভিক্ষুরা বগুড়া জেলার জগদ্দল বিহারে আশ্রয় নেন।[৪] কিন্তু শরৎচন্দ্র দাশ তাঁর উক্ত প্রবন্ধে এমন কথা বলেননি যে, ১২০০ সালে বিক্রমশীলা ও উদন্তপুরী বিহার দুটিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। বরং তিনি তাঁর সম্পাদিত তিববতীয় শাস্ত্র 'পাগ সাম জন জ্যাং'-এ (১৭৪৭ সালে সমাপ্ত)[৫] বলেছেন, বিহার দুটি ধ্বংস হয়েছিল ১২০২ সালে। ফলে শাক্য শ্রীভদ্র জগদ্দল বিহারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই ঘটনা বখতিয়ারের বিহার অভিযানের (১২০৩) পূর্বেকার। আর এই বিহার অভিযানেও বিক্রমশীলা ও উদন্তপুরী মহাবিহার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিহার দুটি ছিল বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঐতিহাসিক মিনহাজ সিরাজী বিহার অভিযানের ৩৯ বছর পর লোকমুখে (১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজির বাংলা অভিযানে অংশগ্রহণকারী দুই সৈনিক ছিলেন নিজামউদ্দিন ও সামসামউদ্দিন। এই দু-ভাই বিহার অভিযানেও অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের মুখে বিহার ও বাংলা অভিযানের কথা শুনেছিলেন মিনহাজ) শুনে সেই ঘটনা বর্ণনা করেন তাঁর 'তাবাকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থে। তাঁর বর্ণনা মতে বোঝা যায়, যে বখতিয়ার সেই অপারেশনে ভুল করে উদন্তপুরী মহাবিহারের উপর আক্রমণ চালান। কেননা মহাবিহারটি বাহির থেকে সামরিক দুর্গের মতো দেখাচ্ছিল। পরে তিনি বুঝতে পারেন আসলে এটি ছিল একটা মহাবিহার তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই আক্রমণে প্রতিষ্ঠানের অধিবাসী বৌদ্ধ ছাত্র ও বৌদ্ধ ধর্মগুরু সকলে নিহত হয়। তবে কারো মতে, সেই মঠটি ছিল নালন্দা। এও মনে করা হয়, যেহেতু দুটি মহাবিহারই কয়েক মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত ছিল, সেহেতু উভয়ের ক্ষেত্রেই হয়তো একই ঘটনা ঘটেছিল।[৬]

তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, ক্ষতিগ্রস্ত

বখতিয়ার খলজির অভিযানের প্রায় ১০০ বছর পরও নালন্দা সচল ছিল। তাহলে নালন্দা ধবংস হল কিভাবে? এটা হিন্দু ও বৌদ্ধ সংঘাতের ফলশ্রুতি নয় তো? এর জমাটি উত্তর দিয়েছেন ঐতিহাসিক ডি এন ঝা। তিনি বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধদের মধ্যকার চলতে থাকা ঘাত-প্রতিঘাতেই নালন্দা ধবংস হয়। এই ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঝা অনেকগুলো তিববতি রেফারেন্সও দিয়েছেন।

বিহারগুলির মধ্যে নালন্দার নাম নেই। মিনহাজ কেন অন্য কোনো সূত্রেও নালন্দা ধবংসের কথা বলা হয়নি। ১২৩৪ সালে অর্থাৎ বখতিয়ারের বিহার জয়ের ৩০ বছর পর তিববতী সাধু ও জ্ঞানসাধক ধর্মস্বামী (১১৯৭-১২৬৪) মগধে আগমন করেন ও সেখানে অবস্থান করেন। শুধু তাই নয়, তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, যেটা কিনা বখতিয়ারের উদন্তপুর অভিযানের সময় ধবংস হয়েছিল, যেমনটা পণ্ডিতগণ অভিযোগ করেন। নালন্দা মঠকেও তিনি তখন চালু অবস্থায় দেখতে পান। সেখানে মঠাধ্যক্ষ রাহুল শ্রীভদ্রের পরিচালনায় ৭০ জন সাধু অধ্যয়নে নিয়োজিত ছিলেন।[৭] তাছাড়া ধর্মস্বামী লক্ষ করেন যে, বহু বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তখনও নালন্দা ও তার আশেপাশে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।[৮] এমনকি নালন্দাও ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত যথাযথভাবে তার কার্যক্রম চালিয়ে গেছে। তাহলে বিষয়টা দাঁড়াল এই যে, বখতিয়ারের আক্রমণে ১২০৪ সালে নালন্দা সম্পূর্ণ ধবংসপ্রাপ্ত হয় বলে যে প্রচারণা ছিল ধর্মস্বামীর বিবরণে তার উল্লেখ নেই।[৯] তবে তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারকে ধবংস অবস্থায় ও উদন্তপুরীকে তুর্কি সামরিক ঘাঁটিরূপে দেখতে পান।

বখতিয়ার কি তাহলে উদন্তপুরীতে কী আছে জানার পরেও নালন্দা ও বিক্রমশীলা আক্রমণে এগিয়ে গিয়েছিলেন পর পর মহাবিহার তথা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দখল ও ধবংসের কালাপাহাড়ি লক্ষ্য নিয়ে? কিন্তু কোন প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা এমন একথা বলব? মিনহাজউদ্দিন সিরাজী তো স্পষ্টই লিখেছেন, বিহার বা সেকালের উদন্তপুরী অধিকারের পর বখতিয়ার দিল্লিতে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের দরবারে ফিরে যান। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় উদন্তপুরী, বিক্রমশীলা এবং নালন্দা পরস্পরের কাছাকাছিই ছিল। উদন্তপুরী নালন্দা থেকে মাত্র ১৩ কিমি হওয়া সত্ত্বেও বখতিয়ার কেন নালন্দায় যাননি তার আর একটা কারণ, মুসলিম অভিযানের পথপরিক্রমা হতে নালন্দার অবস্থান ছিল বহুদূরে। দিল্লি হতে বাংলার পথনির্দেশিকা ছিল ভিন্ন রকম, সেখানে নালন্দার অস্তিত্বই ছিল না। এ প্রসঙ্গে 'বায়োগ্রাফি অব ধর্মস্বামী' বইয়ের ভূমিকা-লেখক পাটনার কে পি জয়সোয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর অধ্যক্ষ Anant Sadashiv Altekar বলেছেন, "Nalanda was not, like Vikramasila, on the highway leading from Delhi to Bengal, and so the work of completing its destruction required a special expedition."[১০] তিনি পরিষ্কার বলেছেন, এরকম আরও কিছু কারণের জন্যই নালন্দা তুর্কি আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

সাম্প্রতিক গবেষণায় অন্য একটা চিত্র তুলে ধরেছেন ওয়াশিংটনের Kevin Alschuler University-এর রিলিজিয়াস স্টাডিজের প্রফেসর জোহান এলভার্সকগ তাঁর 'বুদ্ধইজম অ্যান্ড ইসলাম অন দ্য সিল্ক রোড' বইয়ে। বৌদ্ধদের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্কের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন— "This is problematic for many reasons, not the least being that the story of Nalanda is not true.For example, not only did local Buddhist rulers make deals with the new Muslim overlords and thus stay in power, but Nalanda also continued as a functioning institution of buddhist education well into the thirteenth century.One Indian master, for example, was trained and ordained at Nalanda before he travelled to the court of Khubilai Khan.We also know that Chinease monks continued to travel to India and obtain Buddhist texts in the late fourteenth century."[১১] অর্থাৎ বখতিয়ার খলজির অভিযানের প্রায় ১০০ বছর পরও নালন্দা সচল ছিল। তাহলে নালন্দা ধবংস হল কিভাবে? এটা হিন্দু ও বৌদ্ধ সংঘাতের ফলশ্রুতি নয় তো? এর জমাটি উত্তর দিয়েছেন ঐতিহাসিক ডি এন

ঝা। তিনি বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধদের মধ্যকার চলতে থাকা ঘাত-প্রতিঘাতেই নালন্দা ধ্বংস হয়। এই ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঝা অনেকগুলো তিব্বতি রেফারেন্সও দিয়েছেন।[১২]

এখানে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, বখতিয়ার খলজি কেন ভুলে উদন্তপুর বিহার আক্রমণ করলেন। তিব্বতী কুলাচার্য জ্ঞানানশ্রী তাঁর 'ভাদ্রকল্পদ্রুম'-এ বলেন যে, সেসময় বৌদ্ধদের নিজেদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন মত ও ধারা প্রচলিত ছিল। সেদিন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে কলহ-বিবাদ এতই উত্তেজনার শিখরে ওঠে যে তাদের একপক্ষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময়ে তুর্কির মুসলিম আক্রমণকারীদেরকে তাদের ওখানে আক্রমণ চালাতে প্রতিনিধি পাঠায়। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে এই প্রেরিত প্রতিনিধিত্ব লক্ষ্মণ সেনেরই ইচ্ছার প্রকাশ ঘটায়। তিনি চেয়েছিলেন, বৌদ্ধদের ক্ষমতা সেখানে ভেঙে পড়ুক। এই উদ্দেশ্যে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদের সূত্র লালন করেন ও দুই বিবাদীর একপক্ষকে বিদেশিদের সাহায্য নিতে উৎসাহ দান করেন। এতে তিনি তাঁদের দুর্বল করে ফায়দা নিতে চেয়েছিলেন। ফলাফল যেটা হল, বখতিয়ারকে যেভাবে গাইড করা হয়েছে সম্ভবত সেভাবেই তিনি অভিযান পরিচালনা করেন। বিহার আক্রমণ প্রতিহত করতে যাঁরাই বাধা দিয়েছে তুর্কি সৈন্যরা তাদেরকে হত্যা করেছে। মিনহাজের বিবরণে স্পষ্ট হয়, বখতিয়ার জানতেন না যে, উদন্তপুর ছিল বৌদ্ধদের একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সেখানে সারি সারি পুস্তক দেখে অনুসন্ধান করে জানেন যে, সেটা কোনো সেনাদুর্গ ছিল না।[১৩] এই বক্তব্য প্রায় সমস্ত সোর্সই নিশ্চিত করেছে।

তাহলে কি তুর্কি সেনাবাহিনীকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল পথে পরিচালিত করা হয়েছে? এটা ব্রাহ্মণ্যবাদের অতি পুরাতন ও বহুল ব্যবহৃত কুটনীতি ও কৌশল যে, তাঁরা স্থানীয় শক্তির মধ্যকার অভ্যন্তরীণ বিরোধকে কাজে লাগিয়ে শত্রুর শত্রুকে দিয়ে নিজের শত্রুকে শায়েস্তা করেন। এ দৃষ্টিতে কুলাচার্য জ্ঞানানশ্রীর বর্ণনাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায় আবদুল মোমেন চৌধুরীর 'দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অফ বুদ্ধিজম ইন সাউথ এশিয়া' গ্রন্থ[১৪] থেকে। তাছাড়া অধ্যাপক যোহান এলভার্সকগ তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে ভারতে বৌদ্ধ-মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে প্রচলিত ধারাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। বৌদ্ধদের উপর মুসলিম সেনাপতি ও শাসকগণ অত্যাচার করেছেন এই ধারণাকে তিনি নাকচ করে দেন। তিনি বলেন, বৌদ্ধদের সঙ্গে মুসলিমদের শত্রুতার প্রচলিত ধারণা পশ্চিমা জগতে তৈরি হয় এবং এটা আরও প্রতিষ্ঠিত হয় আফগানিস্থানের তালিবান কর্তৃক ২০০১ সালে বিশাল বৌদ্ধ মূর্তি ধ্বংসের মাধ্যমে।[১৫]

পাল যুগের সমন্বিত মানবিক সমাজ সেন যুগে এসে শ্রেণি বৈষম্যে এবং বর্ণ বৈষম্যে একেবারেই ভেঙে পড়ে। ধর্ম পালনের অধিকার, সংস্কৃত এবং নিজ কথ্যভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার অধিকার এবং সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে এসময়ে অনেক বৌদ্ধ, নাথ, সহযান প্রভৃতি উদারপন্থীরা প্রাণ-মান বাঁচাতে হিন্দুধর্মে ফিরে যায়। অনেকে তাঁদের জ্ঞান তথা সাহিত্য, দর্শনের পাণ্ডুলিপি নিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। উল্লেখ্য যে, পালযুগে ব্রাহ্মণরা ভূ-সম্পত্তি দান হিসেবে লাভ করলেও সেন যুগে কোনো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি বা পুরোহিতের ভূমি লাভের কোনো প্রমাণাদি আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রেও মেলেনি কোনো বৌদ্ধ বা সাধনবাদী দেব-দেবীর অস্তিত্ব। কৌম জীবন থেকে রাজ শাসনের আওতায় প্রবেশ পর্যন্ত দীর্ঘ হাজার বছরের মধ্যে বাংলা এরূপ সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে সংঘাতময় জীবন প্রত্যক্ষ করেনি বলেই জানা যায়। বস্তুত সেন যুগেই বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজ সাম্প্রদায়িক সংঘাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সমাজের সর্বত্র দেখা দেয় অতিমাত্রায় ভেদ বৈষম্য, ব্যক্তিগত ও শ্রেণিগত বৈষম্য এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাত। যার অনিবার্য পরিণতি হল শিল্প-সাহিত্য, অর্থনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা সমাজের সর্বত্র অধোগতি।

লামা তারানাথ এবং মিনহাজউদ্দিন সিরাজীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, যে সামাজিক এই অধোগতি থেকে মুক্তি পেতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ গোপনে বখতিয়ার খলজির সাথে যোগাযোগ করেছেন তথা গুপ্তচরের কাজ করেছেন। একই সাথে বাংলায় প্রবেশের ক্ষেত্রে বখতিয়ার খলজির পথ প্রদর্শকের কাজ করেছেন। লামা তারানাথ আরও বলেছেন যে, বখতিয়ার সংবাদবাহী ভিক্ষুদের মধ্যস্থতায় বাংলা ও তার পার্শ্ববর্তী অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের রাজাদের নিজ দলভুক্ত করে অনেক বৌদ্ধ আচার্যকে হত্যা করেন এবং উদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা বিহার দখল করেন। ফলে এইসব

বিহারের বেঁচে যাওয়া পণ্ডিতগণ বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন এবং এই কারণে মগধে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়। তারানাথের এই কথা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ থেকে যায়। কারণ যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ছিলেন মুসলমান শাসকদের গুপ্তচর এবং বাংলায় প্রবেশের পথ প্রদর্শক তাদেরকে মুসলমানরা হত্যা করেছিলেন এবং সেই মুসলমানরাই বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্তির কারণ একথা যথেষ্ট যুক্তিসংগত নয়। বরং ধারণা করা যায় যে, যেহেতু বৌদ্ধ ভিক্ষুরা গোপনে সেন শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য মুসলিম শাসকদের সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং গুপ্তচর হিসেবে কাজ করেছেন, সে কারণে সম্ভবত ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন শাসকরাই ওই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকবেন, যা অধিক যুক্তিসংগত মনে হয়। যাই হোক, সেন শাসনের সামাজিক নির্যাতন এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, বল্লাল সেনের সময়ে আরোপিত সামাজিক বিধি আজও বাংলায় 'বল্ললী বালাই' নামে পরিচিত। এরূপ সামাজিক অসংগতি থেকে বাঁচার জন্য এবং যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য বাংলার সাধারণ মুক্তিকামী মানুষ অধীর অপেক্ষা করছিল। একদিকে ব্রাহ্মণ্য শাসনের ভীতি, অন্যদিকে বৌদ্ধ নেতৃত্ব-শূন্যতা সম্ভবত বাংলায় মুসলিম রাজশাসন আগমনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

৩

বখতিয়ার খলজির আক্রমণে যদি নালন্দা না ধ্বংস হয়ে থাকে, তাহলে ধ্বংস হল কীভাবে এবং গ্রন্থাগার পোড়ানোর গল্পটাই বা কোথা থেকে এল? প্রাচীন যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে যে ভয়ংকর সংঘাত চলেছিল কয়েক শতাব্দী ধরে, তার কি কোনো আঁচ লাগেনি নালন্দার গায়ে? কিংবদন্তিতেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে থাকে। তিব্বতী শাস্ত্র 'পাগ সাম জন জ্যাং' নামক গ্রন্থে এমনই একটি তিব্বতী কিংবদন্তির কথা জানা যায়। এই কিংবদন্তি অনুসারে, মুদিত ভদ্র নামে এক বৌদ্ধ সাধু নালন্দার চৈত্য ও বিহারগুলি মেরামত করেন এবং তৎকালীন রাজার এক মন্ত্রী কুকুটসিদ্ধ সেখানে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। আরেকটি গল্প অনুসারে, ভবনটির যখন উদ্বোধন করা হচ্ছিল, তখন দুইজন ক্রুদ্ধ তীর্থিক ভিক্ষু (ব্রাহ্মণ) সেখানে উপস্থিত হন। কয়েকজন তরুণ শিক্ষানবিশ ভিক্ষু তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন ও তাঁদের গায়ে কাপড় কাচার জল ছিটিয়ে দেন। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সেই ভিক্ষুরা সূর্যকে প্রসন্ন করার জন্য ১২ বছর তপস্যা করেন ও তপস্যার শেষে একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞকুণ্ডের 'জাগ্রত ভস্ম' তাঁরা বৌদ্ধ মন্দিরগুলির উপর ছিঁটিয়ে দেন। এতে নালন্দার গ্রন্থাগারে আগুন লেগে যায়। বুদ্ধগয়া, নালন্দা ও রাজগীরে বিখ্যাত তীর্থস্থান অথবা ধ্বংসাবশেষের উপরে লিখিত একটি পরিচিতি পুস্তিকায়ও এর কিছুটা আঁচ পাওয়া যাবে। যদিও সে বর্ণনায় কিছুটা অলৌকিকত্বের তত্ত্ব ঢোকানো হয়েছে। বখতিয়ার খলজির আক্রমণ তত্ত্বের সাথে কোনো ভণিতা না করে পুস্তিকাটিতে এ তথ্য সংযোজিত হয়েছে : "...একদিন ঐ মন্দিরে যখন শাস্ত্রচর্চা চলছিল তখন দুজন কোমল স্বভাবের ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হন। কয়েকটি অল্প বয়স্ক ভিক্ষু তাঁহাদের উপর পরিহাসোচ্ছলে জল ছিটিয়ে দেন। এতে তাঁদের ক্রোধ বেড়ে যায়। বারো বৎসরব্যাপী সূর্যের তপস্যা করে তাঁরা যজ্ঞাগ্নি নিয়ে নালন্দার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে এবং বৌদ্ধ বিহারগুলিতে অগ্নিসংযোগ করেন। ফলে নালন্দা অগ্নিসাৎ হয়ে যায়।"[১৬]

...একদিন ঐ মন্দিরে যখন শাস্ত্রচর্চা চলছিল তখন দুজন কোমল স্বভাবের ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হন। কয়েকটি অল্প বয়স্ক ভিক্ষু তাঁহাদের উপর পরিহাসোচ্ছলে জল ছিটিয়ে দেন। এতে তাঁদের ক্রোধ বেড়ে যায়। বারো বৎসরব্যাপী সূর্যের তপস্যা করে তাঁরা যজ্ঞাগ্নি নিয়ে নালন্দার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে এবং বৌদ্ধ বিহারগুলিতে অগ্নিসংযোগ করেন। ফলে নালন্দা অগ্নিসাৎ হয়ে যায়।

বিশিষ্ট তাত্ত্বিক লেখক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নালন্দা মহাবিহার ধ্বংসের জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আক্রমণকে মান্যতা

দিয়েছেন।[১৭] তিববতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আক্রমণকে মান্যতা দিয়েছেন।[১৮] ঐতিহাসিক বি এন এস যাদবও 'উগ্র হিন্দুদের' ('Hindu fanatics') হাতে নালন্দার গ্রন্থাগার পোড়ানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯] এই মতের দীর্ঘ আলোচনা করেছেন আর এস শর্মা এবং কে এম শ্রীমালি।[২০] ডি আর পাতিল অবশ্য তাঁর পূর্বোক্ত গবেষণাপত্রে (বিহার সরকার কর্তৃক প্রকাশিত) খুব পরিষ্কার করে বলেছেন যে, নালন্দা ধবংস করেছিল শৈবরা।[২১] তিনি এও লিখেছেন যে, ''...the Brahmins deliberately set fire to the famous library (at Nalanda called Ratnodadhi).''[২২] বখতিয়ার খলজির আক্রমণের পূর্বেই যে নালন্দা ধবংস হয়েছিল সে সম্পর্কে ডি আর পাতিল লিখেছেন, ''...All these circumstances would indicate that, quite before Bakhtiar Khilji's invasion, Nalanda had perhaps fallen to decay or ruins already; but how and when actually this happened is still a mystery to be unravelled.''[২৩] ডি আর পাতিলের পূর্বোক্ত গবেষণা আরও প্রমাণ করে যে, 'There is, therefore, reason to believe that Nalanda had met its final end some time in the 11th century i.e.more than hundred years before Bakhtiyar Khilji invaded Bihar in 1197 A.D.'[২৪]

লামা তারানাথ বর্ণনা করেছেন যে, রাজা তুরস্ক যিনি দীর্ঘকাল কাশ্মীরে রাজত্ব করেছিলেন, ঐতিহাসিকেরা যাঁকে মিহিরকুল (৫০২-৫৪২) নামে অভিহিত করেছেন, শৈব ধর্মের অনুসারী বৌদ্ধ নিপীড়ক এই রাজার নেতৃত্বে মধ্য এশিয়ার যুদ্ধবাজ হুনদের দ্বারা নালন্দা প্রথম আক্রান্ত হয়। 'মুর্তিবিনাশী' মিহিরকুল বৌদ্ধদের সহ্য করতে পারতেন না। আমৃত্যু অভিযান চালিয়ে তিনি অসংখ্য বৌদ্ধ উপাসক ও বৌদ্ধদের হত্য করেন। কিপিনের বৌদ্ধসংঘ উৎখাত করে বুদ্ধের পবিত্র ভিক্ষাপাত্র তিনি ধবংস করেন। তাঁর নিষ্ঠুরতা এতটাই ভয়ংকর ছিল যে, কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কলহন তাঁর 'রাজতরঙ্গিনী'তে তাঁকে মৃত্যুদেবতা 'যম'-এর সাথে তুলনা করেছেন (১.২৮৯)। কলহন বলেছেন যে, এই নামটি উচ্চারণ করলে অপবিত্র হতে হয় (১.৩০৪)। হিউয়েন সাঙ মিহিরকুল সম্বন্ধে যে কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা এই: ''...পঞ্চনদ প্রদেশের অন্তর্গত সাকল নামক রাজধানীতে মহারাজ মিহিরকুল সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভারতের সুবিস্তৃত অংশে তাঁহার আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। ইনি অবসর মত বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা করিতে সমুৎসুক হইয়া একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধাচার্য্যকে তৎসমীপে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধাচার্য্যগণের অর্থাদিতে স্পৃহা ছিল না, খ্যাতিলাভেও তাঁহারা উদাসীন ছিলেন। সুপণ্ডিত এবং খ্যাতনামা বৌদ্ধাচার্য্যগণ রাজানুগ্রহকে ঘৃণার চক্ষেই অবলোকন করিতেন। এজন্যই তাঁহারা মহারাজ মিহিরকুলের আদেশ প্রতিপালন করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। একজন পুরাতন রাজ-অনুচর বহুকালাবধি ধর্ম্ম-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি তর্কে প্রাজ্ঞ এবং সুবক্তা ছিলেন। বৌদ্ধাচার্য্যগণ রাজসমীপে তাঁহার নাম প্রস্তাব করিলেন। ইহাতে মিহিরকুল নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পঞ্চনদ ভূমি হইতে বৌদ্ধধর্ম নিষ্কাশন এবং বৌদ্ধাচার্য্যগণকে বিনাশ করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।''[২৫] মিহিরকুলের ভীষণ অত্যাচারে গুপ্ত সাম্রাজ্য জর্জরিত ও ধবংসমুখে পতিত হয়েছিল।[২৬] বহু বৌদ্ধ বিহার তাঁর হাতে বিধবস্ত হয়।[২৭] মিহিরকুল যখন পাটলিপুত্র আক্রমণ করেন তখন নালন্দা মহাবিহার ধবংসপ্রাপ্ত হয়। বহু বৌদ্ধ ছাত্র ও বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এই আক্রমণে। রেভারেন্ড এইচ হিরাস এ বিষয়ে লিখেছেন: 'Nalanda University was not far from the capital, Pataliputra and its fame had also reached Mihirakula's ears.The buildings of Nalanda were then probably destroyed for the first time, and its priests and students dispersed and perhaps killed.'[২৮] স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৪৬৮) ও তাঁর পরবর্তী বংশধরেরা একে পুনর্গঠন করেন। তাছাড়া সাত শতকের মাঝামাঝি সময়ে মগধে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে এবং সেগুলোরও শিকার হতে পারে নালন্দা। নালন্দায় এইসব উপর্যুপরি আক্রমণের তথ্য 'জার্নাল অব দ্য বিহার অ্যান্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি' থেকে পাওয়া যায়।[২৯]

৪

স্কন্দগুপ্তের প্রায় দেড় শতাব্দী পরে বাংলার কর্ণসুবর্ণের রাজা নরেন্দ্র গুপ্ত তথা শশাঙ্ক (খ্রিঃ ৬১৯-৬৩২) এবং শাসক নরেন্দ্র গুপ্ত তথা শশাঙ্কের দ্বারাও নালন্দা আবার ধবংসের মুখে

পড়ে। রাজা হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৪৭) সঙ্গে তাঁর বিরোধ ও ধর্মবিশ্বাস এই ধ্বংসযজ্ঞে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। রাজা হর্ষবর্ধন প্রথম দিকে শৈব ধর্মের অনুসারী হলেও পরে বৌদ্ধ ধর্মের একজন পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হন। অন্যদিকে রাজা শশাঙ্ক ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একান্ত অনুরাগী। ফলে উভয়ের মধ্যে সবসময় শত্রুতা লেগেই থাকত ও উভয়ের মধ্যে একটি বড়ো যুদ্ধ ও সংঘটিত হয়েছিল। শৈব নরপতি শশাঙ্ক বৌদ্ধদের ধর্মীয় স্থান ছাড়াও বুদ্ধগয়াকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেন। সপ্তম শতকের একেবারে প্রথম দিকে কান্যকুব্জ আক্রমণের সময় বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রোশে তিনি বোধিবৃক্ষ আমূল উপড়ে ফেলেছিলেন। রাজা শশাঙ্কের বৌদ্ধ নীতি সম্পর্কে রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' থেকে ধারণা পাওয়া যায়। শশাঙ্কের আদেশ ছিল সেতুবন্ধ হতে হিমগিরি পর্যন্ত যত বৌদ্ধ আছে—বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে তাদের হত্যা করতে হবে; এটা যে না করতে চাইবে তারও মৃত্যুদণ্ড হবে। রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধ ধর্মের মূলোৎপাটনের জন্য এমন কোনো প্রচেষ্টা ছিল না যা করেননি। বুদ্ধের যাবতীয় নিদর্শন লোপ করার উদ্দেশ্যে শশাঙ্কের তাণ্ডব লক্ষ করে রাজা পূর্ণবর্মণ আক্ষেপ করেছিলেন: "জ্ঞানের সূর্য অস্তমিত; বুদ্ধের কিছুই অবশিষ্ট নেই বৃক্ষটুকু ছাড়া এবং সেটিও ধ্বংস করল তারা।" পূর্ণবর্মণ নালন্দা পুনর্নির্মাণ করেন। সম্রাট হর্ষবর্ধন পরে রাজা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন ও শেষপর্যন্ত বাংলার কিছু অংশ করায়ত্ত করেন। তিনিও নালন্দার পুনর্গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। উল্লেখ্য, বৌদ্ধ ও শৈব ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই রাজনৈতিক সংঘাত তথা ক্ষমতার লড়াই এবং এর ফলাফল হচ্ছে উত্তর ভারত হতে বৌদ্ধদের গণবিতাড়ন ও গণহত্যা। এ সময়ে হর্ষবর্ধন একবার হত্যা প্রচেষ্টা থেকে বেঁচে গেলেও পরবর্তীতে এক ব্রাহ্মণ গুপ্ত ঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

এরপর বাংলার সিংহাসন দখল করেন বিহারের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত তীরহুতের জনৈক রাজা অর্জুন, যিনি চিনা সোর্সে 'A-lo-na-shun' (তাঁকে অনূদিত গ্রন্থে 'Arunasva' or 'Arunasa' নামেও দেখা যায়) নামে পরিচিত। তিনি হর্ষবর্ধনের সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন, Hans Bakker তাঁকে হর্ষবর্ধনের অধীনস্থ বলে উল্লেখ করেছেন।[৩০] অর্জুন সিংহাসনে বসার পর একদল ব্রাহ্মণ দুর্বৃত্তের নেতৃত্বে নালন্দা আক্রান্ত হয় ও সেটা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।[৩২] এটাই হচ্ছে নালন্দা ধ্বংসের মূল কারণ। তবে এটি সেসময় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়নি। এ সময় চিনা প্রতিনিধি ওয়াং হিউয়েন রাজা অর্জুন কর্তৃক আক্রান্ত হলে তিনি নেপালে আশ্রয় নেন।[৩২] নেপালের রাজা এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে রাজা অর্জুনকে আক্রমণ ও গ্রেপ্তার করে প্রতিশোধ স্বরূপ চিনে পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে নেপালের রাজার সহযোগিতায় নালন্দা মেরামতির কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। তাছাড়া হর্ষবর্ধনের সময়ে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার নালন্দা মহাবিহার ধূলায় গুড়িয়ে দেওয়ার হুঙ্কারও বিশেষ তাৎপর্যবাহী বলা যেতে পারে।[৩৩] এছাড়াও পাল যুগে কোনো কারণে নালন্দা ভস্মীভূত[৩৪] হলে মহীপাল (৯৮১-১০২৯) আগুনে বিনষ্ট নালন্দা মহাবিহারের সংস্কার করেছিলেন এবং পরবর্তীতে এই সংস্কার কাজ চলতে থাকে। মহীপালের রাজ্যের একাদশ সংবৎসরে উৎকীর্ণ দুটি শিলালিপিতে আগুনে বিনষ্ট নালন্দার সংস্কারের উল্লেখ আছে।

৫

তাহলে কিভাবে চালু থাকা নালন্দা ধ্বংস হয়ে গেল? এর জমাটি উত্তর অধ্যাপক ডি এন ঝা পূর্বেই দিয়েছেন যে, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের বিরামহীন সংঘাত এক্ষেত্রে প্রধানত দায়ী। ঐতিহাসিক এস এন সদাশিবন অবশ্য নালন্দা ধ্বংসের জন্য মুসলমান ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।[৩৫] তিনি লিখেছেন, "The enormous manuscript library of the Nalanda university was set on fire by the Tirthikas (all sects of Brahmins) with the support of Jainas due to the mounting Jealousy they nurtured against the great centre of learning.The Mohammedan militarists continously harassed the Buddhist monks of the university and occasionally tortured them." সদাশিবনের প্রথম অভিযোগটির সমর্থন আছে বুদ্ধ প্রকাশের গ্রন্থে[৩৬]। নালন্দায় অগ্নি সংযোগের জন্য তিনি হিন্দুদেরই দায়ী করে লিখেছেন, "...they (Hindus) performed a Yajna, a fire sacrifice and threw living embers and ashes from the sacrifice into the Buddhist temples.This produced a great conflagration which consumed Ratnabodhi, the nine-storeyed library of the Nalanda University." বুদ্ধ প্রকাশের বই (১৯৬৫) সদাশিবনের বইয়ের (২০০০) চেয়ে

অনেক পুরোনো। এর চেয়েও পুরোনো বই হংসমুখ ধীরাজ সাঙ্কালিয়ার 'দ্য ইউনিভার্সিটি অব নালন্দা' (১৯৩৪)।[৩৭] সাঙ্কালিয়াও যেনতেন প্রকারে প্রমাণ করতে সচেষ্ট যে নালন্দা ধবংস করেছিলেন বখতিয়ার খলজি। তাঁর ধারণা, মিনহাজ যে জায়গার বর্ণনা দিয়েছেন সেটা উদন্তপুরী নয়, নালন্দা। কেন? এ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই সাঙ্কালিয়ার কাছে এবং তিনি সেটা মেনেও নিয়েছেন, "It would thus appear that there is no direct evidence to prove that Nalanda was destroyed by the Mohammedans in the year A.D.1199."[৩৮] সালটা গুলিয়ে ফেলেছেন তিনি। কেননা একটু পরেই তিনি আবার লিখেছেন, "Hence Nalanda was destroyed by the Mohammedans in or about 1205 A.D."[৩৯] প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও সাঙ্কালিয়ার অনুমান, "The Moslem invasion therefore appears to be the immediate cause of the destruction of Nalanda." অবশ্য তিনিও বলেছেন, "according to another tradition, the buildings were razed to the ground by a stupid act of two mendicants. Ridiculed by the young monks, they are said to have propitiated the sun for twelve years, performed a sacrifice and alleged to have thrown embers on the stately structures which reduced them to ashes."[৪০] আর সেটা ঘটেছিল বখতিয়ার খলজি আসার অনেক পরে।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, যজ্ঞের আগুনেই যে নালন্দা পুড়েছিল তার প্রমাণ কি? ফরাসি লেখক Lucien X. Polastron তাঁর বিখ্যাত বই 'বুকস অন ফায়ার'-এ[৪১] যজ্ঞের অঙ্গার ছুঁড়ে ফেলার দীর্ঘ বিবরণ দেওয়ার পরও বলেছেন, গল্পটা এখনও চালু আছে এবং এটা প্রচার করেছিলেন তিববতী লামা ধর্মস্বামী, আর তিনি মোটেই সুবিধার লোক ছিলেন না। তিনি যে 'সুবিধার লোক ছিলেন না', Polastron একথা জানলেন বা বুঝলেন কী করে? সে সম্পর্কে তাঁর কোনো বক্তব্য নেই। বরং কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই সম্পূর্ণ অনুমানের ভিত্তিতে Polastron ধর্মস্বামী থেকে বন্দুক ঘুরিয়ে দিয়েছেন বখতিয়ার খলজির দিকে। ঐতিহাসিক এ এল ব্যাসাম নালন্দা ধবংসের জন্য সরাসরি বখতিয়ারকে দায়ী না করলেও তিনি অবশ্য এটা ধবংসের জন্য মুসলিম আক্রমণকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। কোনো প্রমাণ ছাড়াই তিনি লিখেছেন, "গঙ্গার তীরে তীরে মুসলিম অভিযানের তরঙ্গাভিঘাতেই নালন্দা ও বিহারের অন্যান্য বৌদ্ধ মঠ লুণ্ঠিত ও ধবংসপ্রাপ্ত হয়। গ্রন্থাগারগুলি হয় ভস্মীভূত এবং দলে দলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় আক্রমণকারীদের হাতে।"[৪২] ধীরাজ সাঙ্কালিয়া অবশ্য নালন্দায় আগুন লাগানোর ঘটনার সমর্থনে লিখিত সূত্র উল্লেখ করে লিখেছেন, "The tradition cited from Pag-sam-jon zang ahout the final annihilation of Nalanda by fire may be true, for while excavating the Nalanda-site, heaps of ashes and coals are unearthed, even on the topmost levels after the removal of layers of earth which cover up various sites."[৪৩] কিন্তু এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, একদিকে সাঙ্কালিয়া বলছেন, নালন্দা ধবংস করেছিলেন বখতিয়ার খলজি, আবার পরে হিন্দুদের দ্বারা নালন্দায় অগ্নি সংযোগের ঘটনাও সত্যি বলছেন। তাহলে এমন পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের উদ্দেশ্যই বা কি? তিনি কি নালন্দা ধবংসের বা নালন্দার লাইব্রেরি পোড়ানোর আসল কারণ আড়াল করতে চাইছেন?

শুধু নালন্দাই নয়, ময়নামতী মহাবিহারও (অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত) ধবংস হয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে। নালন্দার মতো এক্ষেত্রেও দায়ী করা হত মূলত মুসলিম আক্রমণকারীদের। একাদশ শতকের শেষভাগে বৌদ্ধ চন্দ্রবংশ উৎখাত করে অবিভক্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্মণ রাজবংশ। এই বংশেরই অন্যতম শাসক ছিলেন জাতবর্মা। রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারের প্রতি। তিনি অচিরেই বৌদ্ধবিহারটি অবরুদ্ধ এবং লুণ্ঠন করেন। অবশেষে অগ্নি সংযোগে মহাবিহারটি ধবংস করেন।[৪৪] ওই বিহারের মঠাধ্যক্ষ সুপণ্ডিত করুণাশ্রী মিত্রকেও তিনি অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করেন।[৪৫] ভোজবর্মার বেলাবলিপি থেকেও জানা যায়, পরম বিষ্ণুভক্ত জাতবর্মা সোমপুরের মহাবিহার ধবংস করেছিলেন। বৌদ্ধ নিপীড়নের কিছু নমুনা প্রসঙ্গে বিখ্যাত সোমপুর মহাবিহার ধবংসের কথা নীহাররঞ্জন রায় এভাবে উল্লেখ করেছেন: "...ভারতীয় কোনও রাজা বা রাজবংশের পক্ষে পরধর্মবিরোধী হওয়া অস্বাভাবিক, এ যুক্তি অত্যন্ত আদর্শবাদী যুক্তি, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি তো নয়ই। অন্যকাল এবং ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তের বা দেশখণ্ডের

অন্যকাল এবং ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তের বা দেশখণ্ডের দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়া লাভ নাই; প্রাচীনকালের বাঙলাদেশের কথাই বলি। বঙ্গাল-দেশের সৈন্য-সামন্তরা কি সোমপুর মহাবিহারে আগুন লাগায় নাই? বর্মণ রাজবংশের জনৈক প্রধান রাজকর্মচারী ভট্ট-ভবদেব কি বৌদ্ধ পাষন্ড বৈতালিকদের উপর জাতক্রোধী ছিলেন না? সেন-রাজ বল্লাল সেন কি 'নাস্তিকদের (বৌদ্ধ) পদচ্ছেদের জন্যই কলিযুগে জন্মলাভ' করেন নাই?

দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়া লাভ নাই;প্রাচীনকালের বাঙলাদেশের কথাই বলি। বঙ্গাল-দেশের সৈন্য-সামন্তরা কি সোমপুর মহাবিহারে আগুন লাগায় নাই? বর্মণ রাজবংশের জনৈক প্রধান রাজকর্মচারী ভট্ট-ভবদেব কি বৌদ্ধ পাষন্ড বৈতালিকদের উপর জাতক্রোধী ছিলেন না? সেন-রাজ বল্লাল সেন কি 'নাস্তিকদের (বৌদ্ধ) পদচ্ছেদের জন্যই কলিযুগে জন্মলাভ' করেন নাই?"[৪৬]

৬

দেখা যাচ্ছে যে, পঞ্চম শতকে গুপ্ত সম্রাটদের বদান্যতায় নালন্দার প্রকৃত গোড়াপত্তন হলে এই প্রতিষ্ঠান এদেশে উচ্চশিক্ষা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে যে গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত দীর্ঘ আটশো বছর তা অব্যাহত ছিল। সপ্তম শতকে চিনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ ও ইৎ-সিং নালন্দার সংগঠন, কর্মপদ্ধতি লক্ষ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা নালন্দা মহাবিহারের যে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ও গবেষণার দ্বারা তার যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়েছে। আটটি কলেজ, কয়েকটি সুবৃহৎ আগার, গ্রন্থাগার, মানমন্দির, শ্রমণ, অধ্যাপক ও ছাত্রদের বাসস্থানের উপযোগী বহু বিচিত্র সৌধমালার অপূর্ব সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হয়েছিল। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা বেষ্টন করে ছিল একটি দীর্ঘ প্রাচীর। ইৎ সিং-এর বর্ণনায় জানা যায়, প্রায় ৩০০০ শ্রমণ ও বিদ্যার্থী অবস্থান করবার মত ব্যবস্থা নালন্দায় ছিল। হিউয়েন সাঙ-এর জীবনীকার হুই-লি এই সংখ্যাকে ১০,০০০ বলে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাটত্বের আভাস পাওয়া যায়।

এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, বখতিয়ার খলজি কর্তৃক নালন্দা ধ্বংসের বিষয়টি খুবই বিতর্কিত—এ নিয়ে কোনো সহজ সিদ্ধান্তে আসা যায় না। বখতিয়ার তৎকালীন বিহারের রাজধানী হিসেবে ১২০৩ সালে আক্রমণ চালিয়েছিলেন উদন্তপুরীতে। কিন্তু তা ধ্বংস করেছেন বলা অতিরঞ্জিত। তিনি ভুলে সামরিক দূর্গ ভেবেই উদন্তপুরীতে হামলা করেছেন। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার পোড়ানোর বিষয়টি উল্লেখ করা হলেও তা রটনা মাত্র। অন্যদিকে হামলা তো দূরের কথা, বখতিয়ার নালন্দাতেই যাননি। মিনহাজ নালন্দা ধ্বংস নিয়ে কোনো কথা বলেননি। এরপরেও অবশ্য কিছু পণ্ডিত নালন্দা ধ্বংসের জন্য বখতিয়ারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। উল্লেখ্য যে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলুপ্তির সঙ্গে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ধানের একটি সম্পর্ক রয়েছে। সপ্তম শতকে ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের সময় হিউয়েন সাঙ লক্ষ করেছিলেন, যে এককালের সক্রিয় বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে পতনের দিকে এগিয়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, তিনি নালন্দার পরিসমাপ্তির দুঃখজনক পূর্বাভাষও পেয়েছিলেন। সেই সময় বৌদ্ধধর্ম দ্রুততার সঙ্গে তার জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিল। কেবলমাত্র অধুনা বিহার ও বাংলা অঞ্চলের রাজারাই এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন। পাল শাসনকালে বৌদ্ধধর্মের প্রথাগত মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ে গোপন আচার অনুষ্ঠান ও যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত তান্ত্রিক কার্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত হয়। পাশাপাশি এই ধর্মমতে সহজযান, বজ্রযান প্রভৃতি নানা গোষ্ঠীও তৈরি হয় এবং এই গোষ্ঠীগুলির অন্তর্কলহে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে ক্ষয় পেতে শুরু করে। তাছাড়া সংঘে নারীদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়ায় এবং ভিক্ষুনীদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াও সংঘগুলিতে অনাচার ও অনৈতিকতা প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মদেও আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

ফলে জনমানসে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হতে লাগল।[৪৭] সেইসঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশে বৈষ্ণব ও শৈব দার্শনিক— যেমন উদ্যোতকর, কুমারিল ভট্ট, শংকরাচার্য, উদয়নাচার্য, বাচস্পতি মিশ্র প্রমুখের আগ্রাসন, ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকদের চরম বৌদ্ধ দ্বেষ নীতি এবং একাদশ শতকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজবংশের পতনের ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে, সে সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের উপর রাজনৈতিক-দার্শনিক-নৈতিক দিক হতে চরম আঘাত নেমে এসেছিল।

এ সত্বেও ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে বখতিয়ার খলজির বিহার আক্রমণই ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের ওপর শেষ আঘাত হেনেছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যে যাদের গোপন সাহায্যে বখতিয়ার তথা মুসলিমরা বিহার ও বাংলা জয় করলেন তাদের উপর বা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর মুসলমানরা চরম আঘাত হানবেন এমনটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। আসল কথা হল, নালন্দা ধবংস হয়েছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের হাতেই। নালন্দা মহাবিহার ধবংসে অর্থনীতির বিষয়টিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা, আমরা যখন বলি রাজনীতি সর্বদাই অর্থনীতিকে অনুসরণ করে তখন ভিন্ন প্রেক্ষাপটের দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। সমাজে তখন প্রচলিত ছিল বিদ্যা শিক্ষাদানের জমজমাট ব্যবসা। এক-একজন ব্রাহ্মণ পরিবারে কম করে হলেও চার-পাঁচশ ছাত্র থাকত। এরা গুরুর কাছে শুধু বিদ্যাশিক্ষাই করত না, গুরুগৃহের যাবতীয় কাজকর্ম ভাগ করে নিত। যার ফলে আরাম-আয়েশের দিক দিয়ে একেকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এক-একজন সামন্তের মতো দিন যাপন করতেন। আচার্যের গ্রাম একটি ছোট্ট সামন্ত রাজের গ্রামের মতোই প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ছিল, যদিও এই আচার্য ছিলেন রাজ-পুরোহিত। আর এখানেই আঘাত হানে বৌদ্ধ ধর্মীদের বিহার সমূহ। বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল বিহারগুলি। শত শত আবাসিক বিহার গড়ে ওঠে সারা ভারতভূমিতে। বিদ্যাশিক্ষার জন্য দলে দলে বিদ্যার্থীরা নাম লেখাতে থাকে নানা বিহারে। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সংখ্যাও কম নয়। ইতিমধ্যে তাদের পরিবার বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়ে নেয়। তাছাড়া বিদ্যাদানের ব্যাপারে বিহারগুলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল—এসবের কোনো বৈষম্য ছিল না। সব শ্রেণির মানুষের জন্য বিহারের দরজা ছিল উন্মুক্ত। ফলে টোলের ব্রাহ্মণদের বিদ্যাদানের ভাটার টান ধরে, একদমই মহাভাটা। অতএব, নালন্দা বিহার ধবংস করা অর্থনৈতিক কারণেও তাদের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে।

ঐতিহাসিক ডি আর পাতিল তাঁর 'অ্যান্টিকোয়ারিয়ান রিমেইন্স অফ বিহার' গ্রন্থে (বিহার সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, এটা নালন্দা ধবংসের উপর লিখিত একমাত্র গবেষণাপত্র) বলেছেন যে, শৈবরাই নালন্দা ধবংস করেছিল। তিনি এও লিখেছেন যে, নালন্দা ধবংস হয়েছিল বখতিয়ারের বিহার আক্রমণের পূর্বেই। স্কন্দগুপ্তের সময়ে (৪৫৫-৪৬৮) নালন্দা প্রথম আক্রান্ত ও ধবংস হয় শৈব রাজা মিহিরকুলের দ্বারা। প্রায় দেড় শতাব্দী পরে গৌড়রাজ শশাঙ্কের সময়ে (৬০৬-৬৪৭) নালন্দা দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হয়। এটা ছিল রাজা শশাঙ্ক ও কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধনের সংঘর্ষের ফলশ্রুতি। এরপর উত্তর বিহারের তিরহূতের রাজা অর্জুনের সময় একদল ব্রাহ্মণ দুর্বৃত্তের হাতে নালন্দা আক্রান্ত হয় ও আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও পালযুগে মহীপালের সময়ে (৯৮১-১০২৯) নালন্দা আগুনে বিনষ্ট হয়। বার বার ধবংসপ্রাপ্ত নালন্দার সংস্কারও হয়েছিল সময়ে সময়ে। তবে তা সত্ত্বেও শেষরক্ষা হয়নি।

৭

সুতরাং স্পষ্টতই বলা যায় যে, বখতিয়ার বিহার ও পরবর্তীতে বাংলায় অভিযান চালিয়েছেন সত্য এবং সেটা তিনি করেছেন বৌদ্ধ দের আহবানে। সেটা করতে গিয়ে তাঁর বাহিনীর হাতে উদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা মহাবিহার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে বহু মানুষও মারা গিয়েছিল। কিন্তু বখতিয়ার ঐতিহাসিক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধবংসের সংগে কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না। বরং বখতিয়ারের সময় ও পরবর্তী মুসলিম শাসনে নালন্দা সহ অনেক বৌদ্ধ বিহারে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পূর্বের মতোই জ্ঞানচর্চা চলেছিল। কিন্তু দেশীয় ও বিদেশীয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও মূলত অষ্টম শতকের শেষভাগ থেকে নালন্দার গৌরব-সূর্য ধীরে ধীরে অস্তমিত হতে থাকে, বিশেষ করে ৮১০ সালে বিক্রমশীলা মহাবিহার প্রতিষ্ঠার পরই। পাল রাজাদের সময়ে বিক্রমশীলার পরিচালকবৃন্দই নালন্দা পরিচালনা করতেন। তার ওপর তখনকার নানা গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ ও আভ্যন্তরীণ

দ্বন্দ্বে দীর্ণ নালন্দা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি। অথচ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমূলে ধ্বংস করা ও বৌদ্ধ ধর্মকে তার উৎসস্থল হতে নির্মূল করার জন্য বখতিয়ারের উপর দোষারোপ করা হয়—এটা ঐতিহাসিক সততার চরম ও কদর্য বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিকগণের এই প্রচেষ্টা তাঁদের বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক জ্ঞানের চরম দীনতা প্রকাশ করে।

তথ্যসূত্র

১। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, নালন্দার পরিচিতি ছিল কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের কারণে, অথচ এরকম মহাবিহার (বিশ্ববিদ্যালয়) তখন আরও ছিল। যেমন সৌরাষ্ট্রের বলভী বিশ্ববিদ্যালয়। এটাও নালন্দার মতোই ২০০ গ্রাম থেকে রাজস্ব পেত। (ডি এন ঝা, আর্লি ইন্ডিয়া : এ কনসাইজ হিস্ট্রি, বাংলা সং- আদি ভারত : একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৮০)।

২। ডি এন ঝা, হাউ হিস্টরি ওয়াজ আনমেড অ্যাট নালন্দা, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস : ৯ জুলাই, ২০১৪।

৩। ডি এন ঝা, হাউ হিস্টরি ওয়াজ আনমেড অ্যাট নালন্দা, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস : ৯ জুলাই, ২০১৪।

৪। যদুনাথ সরকার সম্পাদিত, হিস্টরি অফ বেঙ্গল, খণ্ড-২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ৩২-৩৩।

৫। 'পাগ সাম জন জাং' আঠারো শতকের এক তিববতী পণ্ডিতের লেখা বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস। শরৎচন্দ্র দাস ১৯০৮ সালে ইংরেজি সূচিপত্র ও টীকাসহ এর একটি সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। পাগ সাম জন জ্যাং : হিস্টরি অফ দ্য রাইজ, প্রোগ্রেস অ্যান্ড ডাউনফল অফ বৌদ্ধ ইজম ইন ইন্ডিয়া, এডিটেড বাই শরৎচন্দ্র দাস, প্রেসিডেন্সি জেল প্রেস, কলকাতা, ১৯০৮। এই বইটির এখনও কদর আছে।

৬। এইচ ধীরাজ সাংকালিয়া, ইউনিভার্সিটি অফ নালন্দা, বি জি পাল অ্যান্ড কোম্পানি, মাদ্রাজ, ১৯৩৪, পৃ. ২১২।

৭। জর্জ রোয়েরিখ সম্পাদিত, বায়োগ্রাফি অফ ধর্মস্বামী, কে পি জয়সওয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পাটনা, ১৯৫৯, ইনট্রোডাকশন, পৃ. xx.

৮। জর্জ রোয়েরিখ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, ইনট্রোডাকশন, পৃ. xix.

৯। জর্জ রোয়েরিখ সম্পাদিত, ইনট্রোডাকশন, ভূমিকা, পৃ. xix. পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এই মত পোষণ করেন যে, মুসলমান আক্রমণের পরও সেখানে বহু মন্দির ও বিহার নির্মিত হয়েছিল। (রমেশচন্দ্র মিত্র, ডেকলাইন অফ বুদ্ধ ইজম ইন ইন্ডিয়া, শান্তিনিকেতন, ১৯৪৯, পৃ. ৪৬)। লামা তারানাথও তাঁর বর্ণনায় গুজরাট, রাজপুতানায় মুসলমান বিজয়ের পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের পুনরুজ্জীবনের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বুদ্ধ চরিত' (১৯১১) নামে একটি পদ্য রচনার কথা বলা যায়, যেখানে বুদ্ধ কে বিষ্ণুর অবতার বলা হয়েছে। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্মের প্রায়-অবলুপ্তির কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বা প্রকৃতির সঠিক বর্ণনা করা দুরুহ ব্যাপার।

১০। জর্জ রোয়েরিখ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, ইনট্রোডাকশন, পৃ. xx.

১১। যোহান এলভার্সকগ, বুদ্ধ ইজম অ্যান্ড ইসলাম অন দ্য সিল্ক রোড, ফিলাডেলফিয়া : ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়া প্রেস, ২০১০, ইনট্রোডাকশন, পৃ. ২।

১২। ডি এন ঝা, হাউ হিস্টরি ওয়াজ আনমেড অ্যাট নালন্দা, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস : ৯ জুলাই, ২০১৪।

১৩.। জার্নাল অফ বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাজশাহী, ১৯৪০।

১৪। আবদুল মোমেন চৌধুরী, দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অফ বুদ্ধিজম ইন সাউথ এশিয়া, ইনস্টিটিউট অফ সাউথ এশিয়া, লন্ডন, ২০০৮।

১৫.। যোহান এলভার্সকগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

১৬। বুদ্ধ গয়া গয়া-দর্শন রাজগীর নালন্দা পাওয়াপুরী: পর্যটক সহায়ক পুস্তিকা, নালন্দা, পৃ. ১৬-১৭; দ্রঃ-আমীর হোসেন, বাঙালীর বিভাজন, অনুষ্টুপ, বিশেষ শীতকালীন সংখ্যা ১৪০৮, কলকাতা।

১৭। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬। দেখুন-পাগ সাম জন জ্যাং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদ চট্টরাজ লিখেছেন, "দু'জন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নালন্দায় আসেন এবং কোনো কারণে নালন্দায় শিক্ষার্থীদের দ্বারা অপমানিত হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আগুন লাগিয়ে এই বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংস করে দেয়।" (শ্যামাপ্রসাদ চট্টরাজ, ভারতের শিক্ষার ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৮৭)।

১৮। Lama Taranatha, History of Buddhism in India, English translated from Tibetan by Lama Chimpa & Alka Chattopadhyaya, Edited by Debiprasad Chattopadhyaya, Motilal Banarsidass Publishers Private Ltd, Delhi, reprint, 1990, P. 141-142.

১৯। বি এন এস যাদব, সোসাইটি অ্যান্ড কালচার ইন নর্দার্ন ইন্ডিয়া ইন টুয়েলভথ সেঞ্চুরি, রাকা প্রকাশন, এলাহাবাদ, ২০১২, পৃ. ৩৪৬।

২০। আর এস শর্মা ও কে এম শ্রীমালি, এ কমপ্রিহেন্সিভ হিস্টরি অফ ইন্ডিয়া, খণ্ড-৪, ভাগ-২, অধ্যায় ২৫-খ: বৌদ্ধ ধর্ম, মনোহর পাবলিশার্স, নিউদিল্লি, ২০০৮, পাদটীকা, পৃ. ৭৯-৮২।

২১। ডি আর পাতিল, অ্যান্টিকোয়ারিয়ান রিমেইন্স অফ বিহার, কে পি জয়সওয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পাটনা, ১৯৬৩, পৃ. ৩২৭।

২২। ডি আর পাতিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫।

২৩। ডি আর পাতিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪।

২৪। ডি আর পাতিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫।

২৫। দেখুন- যতীন্দ্রমোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, খণ্ড-২, প্রথম দিব্যপ্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৫৯। স্যামুয়েল বিল (ট্রান্সলেটেড), সি ইউ কি : বুদ্ধিস্ট রেকর্ডস অফ দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড, খণ্ড-১, কিগান পল ট্রেঞ্চ ট্রুবনার অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, লন্ডন, ১৯০৬, পৃ. ১৬৭-৭।১ কলহন, রাজতরঙ্গিনী (এম এ স্টেন, ক্রনিকলস অফ দ্য কিং অফ কাশ্মীর, ওয়েস্টমিনিস্টার, ১৯০০, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৬১), খণ্ড-১, পৃ. ৮২৫। আরও দেখুন-রমেশচন্দ্র মিত্র, ডেকলাইন অফ বুদ্ধইজম ইন ইন্ডিয়া, শান্তিনিকেতন, ১৯৪৯, পৃ. ১২০।

২৬। দেখুন--যতীন্দ্রমোহন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

২৭। এ এল ব্যাসাম, দ্য ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া, বাংলা সংস্করণ- অতীতের উজ্জ্বল ভারত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩৬১। ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড ও চ্যাটার্জির যৌথ প্রচেষ্টায় লিখিত 'A short History of India' গ্রন্থের ৯৮ পৃষ্ঠায়ও এ তথ্য রয়েছে। হিউয়েন সাঙ জানিয়েছেন, মিহিরকুল ১৬০০ বৌদ্ধস্তূপ ও মন্দির ধবংস করেন এবং হাজার হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে হত্যা করেন। তাঁর বিবরণকে সমর্থন করেছেন একাদশ শতকের ঐতিহাসিক কলহন; যিনি কাশ্মীরের রাজা হর্ষ কর্তৃক বৌদ্ধদের নিগ্রহের উল্লেখ করেছেন। (ডি এন ঝা, এক হিন্দু আত্মপরিচয়ের খোঁজে, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ২৫)।

২৮। রেভারেন্ড এইচ হিরাস, দ্য রয়েল পেট্রনস্ অফ দ্য ইউনিভার্সিটি অফ নালন্দা, দেখুন- জার্নাল অফ দ্য বিহার অ্যান্ড উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি, পার্ট-১, খণ্ড-১৪, ১৯২৮, পৃ. ৮-৯।

২৯। জার্নাল অফ দ্য বিহার অ্যান্ড উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি, প্রাগুক্ত।

৩০। হান্স বেকার, দ্য ওয়ার্ল্ড অফ দ্য স্কন্দপুরাণ: নর্দার্ন ইন্ডিয়া ইন দ্য সিক্সথ অ্যান্ড সেভেন্থ সেঞ্চুরিজ (সাপ্লিমেন্ট টু গ্রোনিনজেন ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ), ব্রিল অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, লিডেন, নেদারল্যান্ডস, ২০১৪, পৃ. ১২৮-২৯।

৩১। ডি ডি কোসাম্বী, দ্য কালচার অ্যান্ড সিভিলাইজেশন অফ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া ইন হিস্টরিক্যাল আউটলাইন, লাহোর, ১৯৯১, পৃ.১৮০।

৩২। শৈলেন্দ্রনাথ সেন, অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্টরি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন, নিউ এজ ইন্টারন্যাশনাল, নিউদিল্লি, ১৯৯৯, পৃ. ২৬।

৩৩। দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত ইতিহাসের সন্ধানে, আদিপর্ব: দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ১৫৮।

৩৪। Amalananda Ghosh, A Guide to Nalanda, Publisher : Director General of Archaeology in India,.5th edition, Archaeological Survey of India, New Delhi, 1965, P. 13.

৩৫। এস এন সদাশিবন, এ সোস্যাল হিস্টরি অফ ইন্ডিয়া, এ পি এইচ পাবলিশিং, নিউদিল্লি, ২০০০, পৃ. ২০৯।

৩৬। বুদ্ধ প্রকাশ, অ্যাস্পেক্টস অফ ইন্ডিয়ান হিস্টরি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন, শিবলাল আগরওয়াল, আগ্রা, ১৯৬৫।

৩৭। এইচ ধিরাজ সাংকালিয়া, ইউনিভার্সিটি অফ নালন্দা, বি জি পাল অ্যান্ড কোম্পানি, মাদ্রাজ, ১৯৩৪।

৩৮। এইচ ধিরাজ সাংকালিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।

৩৯। এইচ ধিরাজ সাংকালিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।

৪০। এইচ ধিরাজ সাংকালিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

৪১। লুসিয়েন পোলাস্ত্তঁ, বুকস অন ফায়ার : দ্য ডেস্ট্রাকশন অফ লাইব্রেরিজ থ্রুআউট হিস্টরি, ইনার ট্রাডিশন্স পাবলিকেশন, রোচেস্টার, ইউনাইটেড স্টেটস্, ২০০৭।

৪২। এ এল ব্যাসাম, অতীতের উজ্জ্বল ভারত, বাংলা সংস্করণ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৮, পৃ. ৩৬২ ও পৃ. ২২৫, ৩৬০।

৪৩। এইচ ধিরাজ সাংকালিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।

৪৪। এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খণ্ড-২১, বিপুলশ্রী মিত্রের নালন্দা তাম্রশাসন, পৃ. ৯৭। আরও দেখুন- শামসুন নাহার, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের আলোকে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ধারাবাহিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৮৯।

৪৫। এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় পংক্তি দ্রষ্টব্য।

৪৬। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং হাউস, সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা, ১৪১৬, পৃ. ৫০৬ ও পৃ. ৪১৯, ৩০২।

৪৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রচনা সংগ্রহ, খণ্ড-৩, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৮।

বি দ্র : সাধারণভাবে 'উজ্জীবন' এ আলাদা করে তথ্যসূত্র মুদ্রিত হয় না। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী অবস্থান নেওয়া হল।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজই বঞ্চিত কেন? রাজনৈতিক দিশা কী?

মুহাম্মদ আফসার আলী

বঞ্চিত সমাজ কারা?

যে সব মানুষ দেশের স্বাধীনতার ন্যায্য অধিকার পাননি তাঁরাই বঞ্চিত সমাজ। স্বাধীনতার ন্যায্য অধিকার বলতে দেশের সম্পত্তি, পরিষেবা ও সুযোগ-সুবিধায় সকল দেশবাসির সমান অধিকারের কথা বোঝায়। পরাধীন দেশে এই নাগরিক অধিকারের বিষয়টি প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও স্বাধীন দেশে এটাকে নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। খেদের বিষয় হল, আমাদের দেশ দীর্ঘদিন হল স্বাধীন হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক দেশবাসিই তাদের ন্যূনতম নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। আরও উদ্বেগের বিষয়, যত দিন যাচ্ছে সেই বঞ্চনার পরিধি ও মাত্রা ততই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে! সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে প্রকাশ, দেশের মোট সম্পত্তির তিয়াত্তর শতাংশই কুক্ষিগত রয়েছে মাত্র এক শতাংশ প্রভাবশালী ব্যক্তির হাতে! ঔপনিবেশিক বানিয়া বৃটিশ শাসকদের হাত থেকে যে প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের হাতে 'দেশের স্বাধীনতার' ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল সেই সম্প্রদায়টিই রাষ্ট্রক্ষমতার বলে ক্রমাগতভাবে আরও বলীয়ান হয়ে একটি অতি প্রভাবশালী সম্প্রদায়ে অর্থাৎ, শাসক শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। শাসক শ্রেণি দীর্ঘদিন নিরবিচ্ছিন্নভাবে শাসকের ভূমিকায় থাকলে অত্যাচারী শোষকে পরিণত হয়, তাঁরাও হয়েছেন। দেশের বাকি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরা এই অত্যাচারী চরম স্বার্থপর শাসকরূপি শোষক শ্রেণির দ্বারা অত্যাচারিত, শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছেন। আমাদের দেশের জনবিন্যাসের নিরিখে প্রায় কুড়ি শতাংশ তপশিলী জাতি, দশ শতাংশ তপশিলি উপজাতি, পঁয়ত্রিশ শতাংশ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং প্রায় কুড়ি শতাংশ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই দেশের বর্তমান বঞ্চিত সমাজ।

বঞ্চনার কারণ ?

গণতন্ত্রের অর্থ যদি দেশবাসির মতামতের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার ব্যবস্থা হয়, তাহলে গণতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত আমাদের দেশের প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষই কীভাবে বঞ্চিত, অত্যাচারিত ও শোষিত হতে পারেন? — অবিশ্বাস্য হলেও এটাই আমাদের দেশের বাস্তবতা! তাহলে সিদ্ধান্তে আসতেই হয় যে, দেশে গণতন্ত্র কার্যকর নয়। আর, যেটা থেকেও নেই, সেটাই তো ফাঁকিবাজি; এটা হল গণতন্ত্রের ফাঁকিবাজি।

গণতন্ত্র মানে প্রতিনিধিত্ব। কিন্তু আমাদের দেশের গণতন্ত্রে প্রতিনিধিত্ব নেই — থাকলেও আছে কেবল পোশাকিরূপে — চলছে গণতন্ত্রের নামে ফাঁকিবাজি। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলছি। রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করে রাজনৈতিক দল; আর, রাজনৈতিক দল চলে হাইকমাণ্ডের হুকুমে। সুপ্রিমো মার্কা আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলির হাইকমাণ্ডেরা আধুনিক যুগের সম্রাট বা রাজার ক্ষমতায় ও ভূমিকায় দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত। রাজতন্ত্রের যুগে সম্রাট ও রাজার হুকুমই যেমন শেষ কথা ছিল, তাঁর কথায় যেমন রাজ্য শাসিত হতো — বর্তমানের গণতান্ত্রিক যুগে শাসক দলের হাইকমাণ্ডের হুকুমই এখন শেষ কথা, তাঁর মর্জিতেই দেশ শাসিত হয়। রাজনৈতিক দলটিতে যত লোকই থাকুন, তারা সব সাধারণ লোক — প্রজা-তুল্য; হাইকমাণ্ডের আদেশ পালনে সবাই তটস্থ; গাফিলতি হলেই শাস্তি অবধারিত। রাজতন্ত্রে কি আর সমাজের প্রতিনিধিত্ব চলে? তাদের কথা বা মতও কেউ শোনে না। আমাদেরও দল ভিত্তিক গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে রাজতন্ত্রে সমাজের প্রতিনিধিত্ব বা মতামত চলে না। গণতন্ত্রে প্রতিনিধির দায়বদ্ধ থাকার কথা সমাজের বা ভোটারদের কাছে, কিন্তু তারা দায়বদ্ধ থাকছেন হাইকমাণ্ডের

কাছে — অর্থাৎ, মাত্র একজন ব্যক্তির কাছে! কারণ, ভোটে দাঁড়ানোর টিকিট পাওয়া থেকে শুরু করে ভোটে জেতা ও পদ বা দপ্তর পাওয়া পর্যন্ত সব কিছুই নির্ভর করছে হাইকমাণ্ডের কৃপার উপরে। হাইকমাণ্ডের প্রতি আনুকূল্যে সামান্য শৈথিল্য প্রকাশ পেলেই যে কোনো এম.এল.এ./এম.পি. বা মন্ত্রির চেয়ার চলে যায়। ভোগবাদী মানসিকতায় প্রশিক্ষিত আমাদের আইনসভার সদস্যরা নিজেদের চেয়ার বাঁচাতে উদগ্রীব। তাই, হাইকমাণ্ডের দ্বারা সেনসর করা বা শেখানো বাক্যবন্ধের বাইরে এই পোষা তোতাপাখিরা কিছুই বলেন না। হাইকমাণ্ড এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ সমাজের কথা আইনসভায় পৌঁছাতে চান না। কারণ, এই সমাজের ন্যায্য অধিকার হরণ করেই তো হাইকমাণ্ডের শাসক সমাজের বাড়বাড়ন্ত। ফলে, সমাজের (ভোটারদের) কথা আইন সভায় পৌঁছায় না, তাদের সমাজের সমস্যার সমাধান হয় না। অন্যদিকে শাসকরা অসহায় সমাজকে আরও নিশ্ছিদ্র উপায়ে শোষণের জন্য আইনি ধারাগুলিকে আরও মজবুত করছেন। ফলস্বরূপ, সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ শোষণের হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছেন না। অন্য দিকে, রাষ্ট্রক্ষমতায় যেহেতু এই সমাজের প্রতিনিধিত্ব নেই; রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরের এই দুর্বল সাধারণ মানুষের সমাজ রাষ্ট্রক্ষমতায় বলীয়ান দূরাচারীদের প্রতক্ষ ও পরোক্ষ মদতে আরও বেশি শোষিত হচ্ছেন। তাদের অসহায়তার মাত্রা বেড়েই চলেছে। সুতরাং, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বঞ্চনার কারণ অর্থনৈতিক নয়, কারণটি বিশুদ্ধভাবেই রাজনৈতিক; গণতন্ত্রের নামে ভাওতাবাজি ও সংবিধানকে শিঁকেয় তুলে রাখার শাসক শ্রেণির ক্ষমতামত্ত ধৃষ্টতা!

সমাধান কিভাবে?

আমাদের দেশের সমাজ এখন সুস্পষ্টভাবে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত - (১) শাসক শ্রেণি (অতি সংখ্যালঘু) ও (২) শাসিত শ্রেণি (সংখ্যাগুরু)। বঞ্চিত সমাজের এই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান এই দুই শ্রেণির কোনো এক পক্ষ থেকে বা উভই পক্ষ থেকেই হতে পারে। তবে, শাসক শ্রেণি চাইলে তাঁদের দীর্ঘ শাসনে সমাজ এতোটা বঞ্চিত হতো না। এখনও যদি তাঁদের শুভ বোধোদয় হয় তাহলে তাঁরা সাধারণ মানুষের বঞ্চনার পথগুলো বন্ধ করতে ব্যবস্থা নেবেন। সেই ব্যবস্থা হল সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব প্রবর্তন করা। দেশ চালানোর জন্য সাধারণ নির্বাচনে কে প্রার্থী হবেন, সেটা কোনো বহিরাগত নিয়ন্ত্রণাধীন দল ঠিক করবে না, প্রার্থী ঠিক করবে সমাজ নিজে — নিজের মধ্য থেকে। এরূপ প্রার্থী সমাজের সত্যিকারের প্রতিনিধি হবেন, কারণ, তিনি তাঁর পদের জন্য তাঁর সমাজের বাইরের কোনো হাইকমাণ্ডের কাছে অনুগত বা দায়বদ্ধ থাকবেন না; তিনি দায়বদ্ধ থাকবেন তাঁর সমাজের কাছে, নিজের ভোটারদের কাছে। তাই, তিনি তাঁর সমাজের সমস্যাগুলি মেটাতে চেষ্টা করবেন, শোষণ ও বঞ্চনা বন্ধ করবেন। কিন্তু শাসক শ্রেণি সেটা করবেন না, সেটা হতে দেবেন না। কারণ নেতৃত্ব যদি সাধারণ সমাজ থেকে উঠে আসে, তাহলে তাঁরা আর শাসক শ্রেণি থাকতে পারবেন না, তাঁদের আধিপত্য থাকবে না। শাসক শ্রেণি নিজেদের আধিপত্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে ব্যস্ত, তাঁরা নিজেদের আধিপত্য চলে যাওয়া তো দূরের কথা, সেটা সাময়িক সামান্য খর্ব হলেও উদভ্রান্ত হয়ে যান। বর্তমানের মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো এই শাসক শ্রেণির প্রতিভূ। সেগুলি সংখ্যাগুরু বঞ্চিত সমাজের ন্যায্য অধিকারের জন্য কাজ করে না, বরং তাঁদের শোষণের ও বঞ্চনার জন্য কাজ করে। তাঁরা যদি সাংবিধানিক ন্যায়ের জন্য কাজ করতেন তাহলে দেশের সংখ্যাগুরু সমাজের এতোটা অসহায় ও বঞ্চিত অবস্থা হতো না।

তাহলে উপায় কী?

(ক) বঞ্চিত সমাজকে নিজেই তাঁদের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হবে — নিজেদের প্রতিনিধি নিজেদের দ্বারাই নির্বাচনে দাঁড় করাতে হবে, জেতাতে হবে। যাঁর শরীরে ব্যথা সেই ভালো বোঝেন, অন্য কেউ সেভাবে বুঝতে পারেন না। সেইরূপ, অন্য সমাজের কোনো ব্যক্তি বা দলের অর্থাৎ হাইকমাণ্ডের দ্বারা এই সমাজের সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। সুতরাং, অন্য সমাজের দ্বারা আধিপত্যকামী দলের পছন্দের প্রার্থীকে বঞ্চিত সমাজ নিজের প্রতিনিধি মনে করলে সমস্যার সমাধান হবে না। বঞ্চিত সমাজের প্রার্থী হতে পারেন সেই সমাজেরই কোনো প্রার্থী। তিনি নিজেদের সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো দলের হতে পারেন অথবা দলহীন প্রার্থীও হতে পারেন।

(খ) অন্য সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীন দলের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য হলে ভোটের আগে বিভিন্ন দলের সামনে নিজেদের সমাজের সমস্যাগুলির ও উন্নয়নের তালিকা পেশ করতে হবে

এবং সেই তালিকা অনুসারে যে দল বঞ্চিত সমাজের স্বার্থে কাজ করতে রাজি হবে, সেই দলকে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অর্থাৎ, বঞ্চিত বৃহত্তর সমাজের ভোট বঞ্চিত সমাজের দ্বারা মনোনীত প্রার্থীকে দেওয়াই উত্তম পথ। সেটা করা নেহাত সম্ভব না হলে, নিজেদের সমাজের সমস্যা সমাধান ও কল্যাণের জন্য ভোটের আগে সকল দলের সঙ্গে দাম দর না করে ভোট দেওয়া মূর্খামি। সব দলের সঙ্গে দাম দর করে যে দলটি সবচেয়ে বেশি মূল্য (অর্থাৎ, নিজেদের সমাজের সমস্যা সমাধান ও সমাজের উন্নতি করতে) দিতে রাজি হবে, সেই দলটির সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়া সম্পন্ন করে তবেই নিজেদের সমাজের ভোটগুলো দিতে রাজি হওয়া উচিত। কোনো অবস্থাতেই যাতে ভোটের আগেই কোনো দল কোনো বিশেষ সমাজের ভোট পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে যায়। এরূপ হলে সেই সমাজের সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নের ব্যাপারে সেই 'নিশ্চিত' দলটি একেবারেই মাথা ঘামাবে না, কোনো উদ্যোগ নেবে না। এমন অবস্থায় সেই দলটি তো জানে যে এই বিশেষ সমাজ হলো আমাদের 'ভোট ব্যঙ্ক', অর্থাৎ, বাঁধা ভোট। তাদের জন্য কিছু করি বা নাই করি — তারা তো আমাদেরকে ভোট দেবেই। আর অন্য দলগুলোও সেই সমাজের সমস্যা নিয়ে কোনো কথা বলবে না — কারণ, তারা তো জানে যে ঐ সমাজের ভোট তাঁদের দল পাবে না; সেগুলো অন্য বিশেষ দলের 'বাঁধা ভোট'। — এরূপ পরিস্থিতি উক্ত সমাজের জন্য রাজনৈতিক আত্মহত্যার সামিল। বঞ্চিত সমাজকে এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে।

(গ) এক ব্যক্তি, এক ভোট, এক মূল্য — আমাদের সংবিধান প্রদত্ত এই অতি মূল্যবান শব্দগুলি হলো সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা স্বরূপ। বঞ্চিত সমাজ সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং, তাঁদের ভোটও সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক। আবার আমাদের দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র প্রচলিত। সুতরাং, সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের হাতে গণতান্ত্রিক ক্ষমতা অর্থাৎ, রাষ্ট্রক্ষমতা থাকার কথা। পরিষ্কার করে বললে, দেশ পরিচালনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা এই বঞ্চিত সমাজের হাতেই ন্যায়সঙ্গতভাবে থাকার কথা। এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্রের মূল কথা; এটাই দেশের সংবিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এবার, বঞ্চিত সমাজের হাতেই যখন রাষ্ট্রক্ষমতা থাকবে তখন সেই সমাজের বঞ্চনার আর কোনো কারণ থাকবে না; তাঁদের সকল সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পারবেন; দেশে সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই অবস্থা বাস্তবায়িত করতে নিজের ও নিজের সমাজের ভোটের অপরিসীম মূল্য বুঝতে হবে। মিষ্টি কথায় ও মিথ্যা ফাঁকা বুলিতে 'ভোট' নামক এতো মূল্যবান ক্ষমতাটিকে হাতছাড়া করা যাবে না। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রতারকদের চিহ্নিত করতে হবে, দূরে সরাতে হবে — তাঁদের কূট-কৌশল সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। ব্যক্তিগত বা সাময়িক স্বার্থে তাৎক্ষণিক সামান্য লাভে বা লোভে ভোট বিক্রি করা বন্ধ করতে হবে। টাকা নিয়ে ভোট বিক্রি করার আগে মাথায় রাখবেন যে আপনি আপনার জীবনের, পরিবারের ও আপনার সমাজের আগামী পাঁচটি মূল্যবান বছর বিক্রি করছেন! এর প্রাপ্য মূল্য কী আপনাকে দিচ্ছে?

বঞ্চিত সমাজের সবই কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এখনও পর্যন্ত তাঁদের কাছে আছে একটিমাত্র অতি কার্যকরী অস্ত্র, যেটার নাম ভোট। বিচক্ষণ চিন্তাবিদ ড. ভীম রাও রামজী আম্বেদকর প্রণীত দেশের সংবিধান এই নিঃস্ব মানুষগুলোর হাতে এই শক্তিশালী অস্ত্রটি দিয়েছে। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রটির দ্বারা নিজেদের আত্মরক্ষা ও নিজেদের সমাজের সমস্যার সমাধান তো করতেই হবে। তাই, চেষ্টা করতে হবে এই অস্ত্রটিকে উপযুক্ত সুরক্ষা দেওয়ার এবং যে কোনো মূল্যে এটিকে নিজেদের হাতছাড়া না করার। কারণ, মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো জিনিসের প্রতিই বিচক্ষণ, ক্ষমতাশালী লোকদের লোলুপ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকে। ক্ষমতা খাটিয়ে বা ছল-চাতুরি দ্বারা তাঁরা সেইরূপ সকল জিনিসই কেঁড়ে নিতে চায়। নিজেদের ভোটের সুরক্ষাকবচ হল চেতনা — নির্দিষ্টভাবে বলতে রাজনৈতিক চেতনা। আক্ষেপের বিষয় হল, যথার্থ শিক্ষার অভাবযুক্ত আমাদের সমাজ চেতনা (বিশেষ করে রাজনৈতিক চেতনা) নামক এই আত্ম-সুরক্ষা কবচটির ব্যাপারে খুবই দৈন্যদশায় রয়েছে! বাস্তবতা হলো, অনেক উঁচু উঁচু ডিগ্রিধারীদেরও রাজনৈতিক চেতনার স্তর হতাশাজনকভাবে কম! শিক্ষার সঙ্গে চেতনার প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকলেও, রাজনৈতিক চেতনা অর্জনের জন্য বিশেষ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দরকার।

ভোট হলো এমন একটি চাবি যার সঠিক ব্যবহারে রাজনৈতিক ক্ষমতা নামক সঠিক তালাটি খোলা যায়। আর, রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে যে কোনো সমস্যারই সমাধান করা যায়। তাই, এই চাবিটিকে চেনা এবং এর সঠিক ব্যবহার, আবারও বলছি, চাবিটির সঠিক ব্যবহারই বঞ্চিত সমাজকে বাঁচাতে পারে।

ফাহিম হাসান

যদি ধর্মের কথা বলো

১.
আমার মধ্যে হয়তো সূর্যের প্রখরতা নেই!
উদয়ের বিশ্বাসটুকু আমার সম্বল বলতে সেই!

২.
তুমি ছাড়া মৃত্যুও অনিবার্য নেই আর!
মানুষের সময় ফুরালে
আছে শুধু প্রস্থানের অধিকার!

৩.
মানুষের পাশে যদি মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো
বুঝে নিও আমার ভালোবাসার অর্ধেকটা তোমারো

৪.
আমি কবিতা লিখতে পারছি না আর!
কবিতা লেখার জন্য ঈশ্বরের হৃদয় দরকার!

৫.
ফড়িং এর হৃদয় নিয়ে হয়তো বা নীলচে আকাশ
দু দন্ড ভালোবাসা যায় তাকে

সমস্তদিন ফড়িং এর অপরূপ চোখে
অনাবিল সে আকাশ ছেয়ে থাকে!

৬.
বাঁচতে আসিনি, বাঁচাতে এসেছি প্রাণ
শুধুই বেঁচে থাকা কখনো কখনো
মৃত্যুর সমান!

৭.
ভালোবাসা যদি হয় এমন এক গভীর অসুখ
যে অসুখ কোনোদিন সারবে না!

নতজানু হয়ে পা দুটি তোমার জড়িয়ে ধরি
বলো ভালোবাসা, কখনো আমাকে ছাড়বে না!

৮.
চোখ রাঙানি দেখে সরিয়ে নেব না চোখ!
আমাদের চোখে চোখে প্রতিবাদ বিস্ফোরিত হোক!

৯.
আমাদের বুকে বুকে বিবেকের ঢেউ এসে লাগুক!
আমাদের হাতে হাতে শাশ্বত মোমবাতি
জ্বলে থাকুক!

অমৃতাভ দে

বাংলাভাষা, রঙিন ঝুমকোলতা

ভোরের আলো যেই ফুটেছে
আমার পুতুলগ্রামে
বাংলাভাষা ঠিক তখনই
পথের পাশে থামে।

পথের পাশের জলছবিতে
বর্ণমালা দোলে,
রোদের ঝিলিক খেলছে যেন
পদ্মদীঘির কোলে।

সেই দীঘিটাই বাংলাভাষা
রূপকথা চুপকথা
সেই দীঘিটাই বাংলাভাষার
রঙিন ঝুমকোলতা

ঝুমকোলতায় জোছনামাখা
শব্দের ঝিকমিক
সেই আলোতেই ভরল দেখো
মনেরই চারদিক।

মন সেজেছে বর্ণমালায়
পথ সেজেছে গানে
এই আঁধারেও বাংলাভাষা
ভোরকে ডেকে আনে।

আবদুর রউফ

বেদনার অন্তহীন

আকাশকে আঁকতে গিয়ে আমি
ক্যানভাসে শুধু দুঃখকে এঁকেছি বারবার।
আমার দু'চোখে শুধু অন্তহীন নীল,
শুধু গাঢ়নীল– দিগন্ত অপার।

এ আকাশে কত সূর্যতারা,
কত চাঁদ, অগণিত নক্ষত্রের স্রোত,
যুগ যুগান্ত ধ'রে জেগে আছে ধ্রুবতারা,
ছায়াপথে অন্তহীন আলোকের উজ্জ্বল উদ্ধার.....

একচক্ষু হরিণের মত নীলকণ্ঠ আমি
শুধু দুঃখকেই পান ক'রে গেলাম।

সমকালীন মিশরীয় কবিতা
ভাষান্তর : ওয়াহিদা খন্দকার

আলা খালেদ

বিখ্যাত মিশরীয় কবি আলা খালেদ ১৯৬০ সালে আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮২ সালে আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ থেকে স্নাতক হন। ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দ্য বডি ইজ সাসপেন্ডেড বাই দ্য উইল অফ কালি' প্রকাশের পর থেকে তিনি আশি ও নব্বইয়ের দশকে মিশরীয় গদ্য কবিতার ইতিহাসে অন্যতম প্রধান নাম হিসাবে বিবেচিত হন। আলা খালেদ মিশরের অভ্যন্তরে এবং বাইরে অনেক কাব্যিক সভায় অংশ নিয়েছিলেন। ২০২২ সালে কায়রো আন্তর্জাতিক বইমেলায় শ্রেষ্ঠ কবিতার পুরস্কার জিতে নিয়েছেন তিনি।

জীবনের পর্দা

তোমার সঙ্গে কথা বলছি
জীবনের পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে
তোমার অনন্ত চোখ দেখে নিচ্ছি
যেন সমুদ্র জিরিয়ে নিচ্ছে তার নিম্ন জোয়ারের পল্লবে
এমনকি কোনো কামনাপূর্ণ ইচ্ছেও অনুপস্থিত
তোমার শরীরের উজ্জ্বলতা
আমাদের যৌথ সময়ের আগে
ছুটে সমস্ত ইচ্ছাকে নম্র করে দেয়
যেন ভাগ্যের সাথে মিলিত হয়, ভাগ্য আগে তার নিজেকে
অনুসরণ করে এবং অতিক্রম করে।

আমাদের বেঁচে থাকা একসঙ্গে

আমাদের একসঙ্গে বেঁচে থাকাটা
খুব সীমিত
যে মুহূর্ত থেকে আমি আসন্ন সমাপ্তি দেখেছি
অনুভব করেছি যে আমি তোমাকে ভালোবাসি
ভালোবাসা সময়কে সংক্ষিপ্ত করে
এবং সমাপ্তি ঘোষণা করে
হতে পারে এটা বিস্তৃত করছে।
অথবা প্রত্যেকে শেষ রহস্যকে বাঁচিয়ে রাখছে
আমিও শেষের স্বাদ নিচ্ছি
দরজার নীচে উঁকি দিচ্ছে আলো
আমাদের বেঁচে থাকা একসঙ্গে

সাফা ফাথি

মিশরের বিখ্যাত প্রতিবাদী কবি হলেন সাফা ফাথি। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে, মিশরের মিনিয়ায়। তিনি বি এ পাশ করেন ব্রিটিশ সাহিত্য নিয়ে, মিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর থেকে, ১৯৮১ সালে। সাফা পিএইচডি করেছেন ইউনিভার্সিটি অফ প্যারিসের অধীনে। মিশরে থাকাকালীন ফাথি ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর কবিতায় সেসব প্রতিবাদের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেল ইউনিভার্সিটি থেকে ফেলোশিপ পাওয়া ছাড়াও ফাথি বহু গ্রান্ট এবং পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি কবিতা পাঠের জন্য বিশ্বব্যাপী বহু সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন (ইউরোপ, মধ্য প্রাচ্য, আফ্রিকা, এশিয়া,

ল্যাটিন আমেরিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। এছাড়া কর্মশালা এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য বিশ্বব্যাপী তার বিচরণ (ডকুমেন্টারি, চলচ্চিত্র কবিতা, শর্ট ফিকশন)।

স্ন্যাপশট

- আপনার পা কে বলুন যেখানে আপনি যেতে চান সেখানে তোমার সঙ্গে যেন না যায় কারণ এই যাত্রাটি একটা অনুপস্থিতির দিকে যায়
- যখন গ্যাস আমার ফুসফুসে প্রবেশ করে, আমি ধূমপানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম
- ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাকে আল আব্বাসি পর্যন্ত নিয়ে গেল। সে আমাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য সে তার হাত বাড়িয়ে দিল। ২০১১ সালে আমরা শহরের শূন্যতার সাথে পরিচিত হই। সে ব্রাদারহুডের প্রতিনিধিত্ব করেন আর আমি অন্যদের চেয়েও অন্য।
- আমরা গ্যাস থেকে বাঁচতে মুখোশ পরেছিলাম। যখন হাঁটছিলাম আমরা ভালো করেই জানতাম যে এগুলি পরস্পরের মুখচেনার লক্ষণ ছিল।
- একজন বৃদ্ধ কোশারির প্লেট নিয়ে আমার কাছে এসেছিল, তাই তাকে বলেছিলাম যে নতুন সংবিধানে অবশ্যই নারীদের পূর্ণ অধিকার থাকতে হবে।
- আমি যখন তালাত হার্ব ব্যারিকেড দিয়ে স্কোয়ারে ঢোকার সময় একটি যুবকের ঠান্ডা হাত আমার হাত চেপে ধরেছিল, আমি তাকে চিৎকার করে বললাম এবং সে আমার জাতীয় নম্বর যাচাই না করেই আমাকে যেতে দিল।
- প্রতিবার যখন রিয়াদের আব্দেলমোমেইন ব্যারিকেড দিয়ে আসি একটি মেয়ে আমার শরীর সার্চ করত আর বলত আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি এখন আজই ওকে ক্ষমা করে দিলাম।
- আমি একজন শেখের পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম, যিনি তাহরির স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন। যখনই তিনি সুন্দর বাক্য বলছিলেন আমি জুড়ে দিচ্ছিলাম "ভালো বলেছেন"। তাই তিনি আরও ভালো কথা বলতে শুরু করলেন।
- পুরুষেরা ফুটপাতে বসে টুকরো কার্ডবোর্ডে শ্লোগান লিখছিল। তারপর ক্লান্ত হয়ে তারা টুপির মতো শ্লোগানগুলিকে মাথায় পরে ফেলল।
- আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে ট্রাফিক পুলিশের সেন্ট্রি বক্সে ঢুকলাম। মূলত ডেল্টা থেকে আসা একজন ইতিহাসের অধ্যাপক ইতিমধ্যেই সেখানে বসেছিলেন। এক রাত দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়ে স্কোয়ারটি সুরক্ষিত রেখেছিলেন।

এটা

এটি কোনো আতঙ্ক নয়, হতাশা নয়, ভয় নয়, ব্যথা বা দুঃখ নয়; এটা তিক্ততা বা ক্রোধ নয়। এটা অবাধ্যতা নয়, এটি কোনও দিনও নয়, এটি রঙিনও নয়, এটি কান্নাও নয়, না আমার বুকের ভার; এটা কোনো আশা পূরণ নয়, তুমি কোথাও যাচ্ছ? এমনও নয়, এটা কোনো গান নয়, না কোনো অশ্রু, এটা না একটা জায়গা, না কোনো নাম, কোনো গোপনও নয়। এটা না একটি ভোর না কোনো হৃদয়, একটি জন্ম নয়, না কোনো রাস্তা, এটা দেয়াল নয়, কোনো প্রতিকৃতিও নয়। এটা কোনো গ্যাস বা মৃত্যু নয়, এটা কোনো কণ্ঠস্বর নয়, কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়, টুইটও নয়। এটা একটি মাথা নয়, না কোনো সংকীর্ণ বাক্যাংশ যা শক্ত করতে পারে, এটা হল আহহহ....

ধারাবাহিক-উপন্যাস

সেখ রফিকুল ইসলাম

ঘূর্ণাবর্ত

(পূর্ব প্রকাশের পর)

সেদিন রাত্রে সঞ্জয়ের সাথে ফোন আলাপের পর সপ্তাহখানেক কেটে গিয়েছে। এই সাত দিন ধরে অতীত স্মৃতিতে হেঁটে বেড়িয়েছি। ঘোর লাগা তৃষ্ণার্ত মাতালের মত। খুঁজে পেতে চেষ্টা করছি জীবন্ত অতীতকে। আজ পঁয়তাল্লিশ বছর পর সময় অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে। কীটদষ্ট স্মৃতি আজ পুঙ্খানুপুঙ্খ স্মৃতিচারণায় অক্ষম। অতীতকে ফিরে দেখার বাসনায় অকুস্থলে সরজমিনে তদন্ত করাই শ্রেয়।

দুবছর আগের ঘটনা। লেখালেখির একটু চর্চা করি, এই সুবাদে শ্যামসুন্দর আসা। রামলাল আদর্শ বিদ্যালয়ের তথা আমাদের স্কুলের অডিটোরিয়াম হলের উত্তর দিকে বেশ কিছুটা ফাঁকা মাঠ। যেখানে ছোটোদের খেলার মাঠ। আমরাও ক্রিকেট খেলেছি, N.C.C প্যারেড ওই জায়গাতেই হত। ওই জায়গাটা এখনও ফাঁকাই আছে। ওই ফাঁকা মাঠের সংলগ্ন উত্তরে U.G.C হোস্টেল। যেখানে কলেজের প্রফেসররা থাকতেন। যা আমাদের কাছে প্রফেসর কোয়ার্টার হিসাবে পরিচিত। ওই ফাঁকা মাঠেই মঞ্চ বেঁধে তথা ম্যারাপ বাঁধা সাহিত্য সভার আসরে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম।

প্রফেসর কোয়ার্টারের গা ঘেঁষেই মঞ্চ তৈরি হয়েছে। সামনে অডিটোরিয়াম হলের দিকে ফাঁকা অংশের উপর সামিয়ানা টাঙিয়ে শতাধিক চেয়ার পাতা হয়েছে। কবি, সাহিত্যিক ও উৎসাহী মানুষদের বসবার জন্য। সুসজ্জিত মঞ্চে বিশিষ্ট আমন্ত্রিতদের জন্য চেয়ারগুলির উপর আলাদা মখমলের পর্দার কভার দেওয়া হয়েছে। সভায় নাম নথিভুক্ত করার সময় টিফিন, চা, দুপুরের খাওয়ার কুপন দেওয়া হয়েছে।

নির্দিষ্ট সময়ে সভার কাজ শুরু হল। সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর আরও দু-চার জন বক্তা সমান-সাহিত্য ও তার উত্তরণ বিষয়ে বক্তব্য বলতে গিয়ে পূর্বতন মনীষীদের উদ্ধৃতি দিয়ে জ্ঞান দান করার চেষ্টা করলেন। বাস্তব বোধ রহিত এই সব শূন্যগর্ভ বাণী উপস্থিত বোদ্ধাদের কতটা স্পর্শ করতে পারলো জানি না। তবে আমার মনে হল তোতা পাখির মত শেখানো বুলি কপচানো বাণী যা পৌনঃপুনিকতায় ক্লিশ। মঞ্চ আলো করে যাঁরা বসে আছেন, আয়োজকদের পক্ষ থেকে তাদেরকে জমকালো ব্যাচ, চন্দনের টিপ, ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধিত করা হল। এঁদের মধ্যে কয়েক জনের মুখ আমার চেনা। বর্তমানে এরা কেউ পঞ্চায়েত প্রধান, সভাপতি, কেউবা জেলা পরিষদের সাংস্কৃতিক বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ। এঁদেরকে বরণ করার সময় সঞ্চালকের সপ্রশংস ব্যাখ্যানে পরিচয় আরও সুস্পষ্ট হল। এই সব মান্যগণ্য ব্যক্তিদের বক্তৃতা শেষে আধ ঘন্টার টিফিন খাওয়ার বিরতি। আমি টিফিনের কুপন নিয়ে গেটের বাইরে স্টলে রাখা রেডিমেড প্যাকেটবন্দী টিফিন সংগ্রহের জন্য যাচ্ছি। এমন সময় গেটের পাশে দর্শক আসনে বসা এক বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন– এই কুপনটা নিয়ে যদি টিফিনটা একটু এনে দেন। আমি বললাম অবশ্যই দেব। কুপনটা দেন। তাঁর হাত থেকে কুপনটা নিয়ে স্টলে গিয়ে দু-প্যাকেট টিফিন এনে ওনার হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিলাম। উনি বললেন– ধন্যবাদ।

পাশের চেয়ারটি খালিই ছিল। সম্ভবত ওই চেয়ারটিতে যিনি বসেছিলেন তিনি এখন বাইরে গিয়ে টিফিন খেতে ব্যস্ত। উনার পাশে বসেই প্যাকেট খুলে টিফিন খেতে শুরু করেছি। উনি প্রশ্ন করলেন– আপনি কোথা থেকে আসছেন? উত্তরে- আমার গ্রামের নাম বললাম; এও বললাম, আমি এই স্কুলেই পড়াশুনা করেছি। আর ওই যে দেখছেন স্কুল হোস্টেল, ওই হোস্টেলেরই উপর তলায় আমরা তিন বন্ধুতে থাকতাম।

উনি:— এ্যাঁ- তাই বুঝি? আগ্রহে- ঔৎসুক্যে উনার চোখ ও বিস্ময়ে ভ্রু কুঁচকে গেছে। আচ্ছা, সালটা বলতে পারবেন? - হ্যাঁ অবশ্যই, ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত।

উনি:— কী নাম— আপনার?—আমার নাম বলতেই, উনি কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। হয়তো স্মৃতির অতল গুহা থেকে পাতা ওল্টাতে গুরু করছেন। আচ্ছা - তোমার কি দেবাশীষ, সঞ্জয়, রতন, কনকের ব্যাচ? - হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

উনি:— আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি তোদের তরুণ স্যার।- স্যার আপনি? চিনতে পারিনি বলে ক্ষমা করবেন। শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে এল, প্রণাম করলাম।—তরুণ স্যার ডান হাতের লাঠিটা বাঁ পাশে সরিয়ে রেখে মাথায় হাত রাখলেন।

স্যার:— আজকে আর আশীর্বাদ করার ক্ষমতাটাও নেই। একবার স্ট্রোক হয়ে যাবার পর বাঁ হাত অসাড়। ডান হাতে -এই লাঠিটাই এখন চলাচলের ভরসা।— স্যার নূতন করে আশীর্বাদের আর দরকার নেই। পুরনো আশীর্বাদ ভাঁড়ারে এখনো যা জমে আছে তাতে করে এই জীবনটা অনায়াসে চলে যাবে।

একথা শুনে স্যার হো-হো করে হেসে উঠলেন।—বলিস কী? তাহলে আশীর্বাদের হাঁড়িটা তোদের উপরেই উপুড় করে ঢেলে দিয়েছিলুম বল। —কথাটা হয়তো ভুল বলিস নি।

সত্যিইতো, তারপর আর মনের মত শিষ্য তৈরি করতে পারলুম কই? কখন যে স্যার আপনি থেকে 'তুই' এ নেমে এসেছেন খেয়াল করিনি। সম্বিত ফিরে পেলাম তাঁর সেই পুরোনো মেজাজের হুকুম নামায়।—যা- ওখান থেকে একটু চা নিয়ে আয়। চা খেতে খেতে গল্প করি।—চা- খাওয়া শেষ হলে একটু যেন ভাবলেন।— আচ্ছা তোর- সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'প্রিয়তমাসু' কবিতাটা মনে আছে?—এ প্রশ্ন শুনে আমিতো হেসে ফেললাম, আবার অবাকও হলাম এই ভেবে যে, এতদিন আগের ঘটনা, এখনও স্যারের মনে আছে।

ঘটনাটা একটু খুলেই বলা দরকার—স্কুলের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'প্রিয়তমাসু' কবিতাটি আবৃত্তি করার জন্য নাম লিখিয়েছিলাম। প্রতিযোগিতার আগের দিন পর্যন্ত স্যারের কাছে বার কয়েক তালিম নিয়েছি।

এখানে ব্যাপারটা হল, যে প্রতিবারই শেষের প্যারাগ্রাফটায় এসে আট্‌কে যেতাম। স্যার নিদান দিয়েছিলেন— উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে, এমন কি বাথরুমে গেলেও যেন মনে মনে কবিতাটি আবৃত্তি করি। যাতে প্রতিযোগিতার আসরে উত্তীর্ণ হতে পারি। প্রতিযোগিতার দিন- একটু উত্তেজনা তো ছিলই, কেন জানি না কন্‌ফিডেন্স তৈরি হচ্ছিল না।

প্রতিযোগিতার আসরে আমার নাম ঘোষণা হতেই পা কাঁপতে লাগলো; তার মধ্যেই আবৃত্তি শুরু করলাম এবং ঠিক ওই খানটাতেই আট্‌কে গেলাম। কয়েক সেকেণ্ড পর, স্যার লাইনটা ধরিয়ে দিলে পুরো কবিতাটা শেষ করলাম ঠিকই, কিন্তু প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী আমি অকৃতকার্য হলাম। অনুষ্ঠান শেষে হোস্টেলে ফিরে এসে স্যারের কি বকুনি— ''বার বার পাখি পড়ানোর মত করে ট্রেনিং দিলুম— আর ঐ জায়গাটাতেই আটকে গেল? তোর দ্বারা কিস্যু হবে না।''

আজ, স্যারকে বললাম— স্যার প্রিয়তমাসু কবিতাটা এখন আবৃত্তি করতে বললে, হয়তো এখনো ওই খানেই আটকে যাবো।

তবে আমার নিজের লেখা কবিতাগুলো না দেখে এক লাইনও বলতে পারবো না। এটা আমার মুদ্রা দোষ।

চায়ের স্টল থেকে আরও এক কাপ চা এনে স্যারকে দিলাম। চা খেতে-খেতেই জিজ্ঞাসা করলাম— এই অশক্ত শরীর নিয়ে আপনি এখানে?

স্যার :- ওই যে দেখছিস মঞ্চের উপর কলারতোলা নক্সাকাটা পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোকটিকে। ও আমার প্রাক্তন ছাত্র। একটা সময় বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ছিল। তারপর পালাবদলের পর ভোল বদল করেছে। ওর মেয়েকে পড়াশুনার ব্যাপারে এখনও একটু আধটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দিতে হয়। হয়তো সেই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই আমাকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।— তাহলে তো আপনার মঞ্চে বসার কথা। আপনি নীচের চেয়ারে কেন?

স্যার :- তুই এখনো সেই ছেলে মানুষই রয়ে গেলি। দেখছিস না— রাজনৈতিক পট্ পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজনৈতিক মঞ্চগুলো তো বটেই, এমনকি অরাজনৈতিক এই সাংস্কৃতিক মঞ্চগুলিতেও কেমন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমি আর কথা না বলে সোজা ওই ভদ্রলোকের কাছে গেলাম। ভদ্রলোককে ঈশারায় নেমে আসতে বললাম। উনি মঞ্চ থেকে নেমে এলেন।—কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলি।—হ্যাঁ বলুন।

আমি তরুণ স্যারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললাম– ওই যে ওই ভদ্রলোকটি ওখানে বসে আছেন, উনি কিন্তু আপনারই আমন্ত্রণে এখানে এসেছেন। উনাকে মঞ্চের উপরে নিয়ে গিয়ে বসানো যায় না?

ভদ্রলোক মাথা নীচু করে– আরও মৃদুস্বরে কানের কাছে এসে বললেন– আমি লজ্জিত ও দুঃখিত। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন– আজকের সভার আয়োজকদের অনেকেরই ওনাকে মঞ্চে স্থান দেওয়ায় আপত্তি আছে। এমনিতে উনি গুণী মানুষ হলেও রাজনৈতিক ভাবে ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করার কারণে ওনাকে মঞ্চে বরণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

ওই তথাকথিত ভদ্রলোকের সাথে কথা বলে ফিরে আসার পর স্যার জিজ্ঞেস করলেন–

–কীরে ওর সাথে কী কথা বলছিলি?

আমি বললাম– স্যার বাড়ি ফিরে যান। আপনাকে আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে দিতে পারি না।

কেন রে– কী হল বলবি তো?

কী করে কী যে বলি, মাথায় তখন আমার আগুন জ্বলছে।

শুধু একটা কথাই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো— 'আপনি এখানে অবাঞ্ছিত'। একরকম জোর করেই স্যারকে চেয়ার থেকে টেনে তুললাম। বাঁ হাত আমারে কাঁধে রেখে, ডান হাতে লাঠি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। একটু দূরে গাছতলায় তাঁর ভাড়া করা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। ড্রাইভারকে ডেকে স্যারকে গাড়িতে তুলে দিলাম। আমিও সভাস্থল থেকে ক্ষুণ্ণমনে বেরিয়ে এলাম।

১৬ তম অধ্যায়
ফিরে দেখা লীলাক্ষেত্র

সামিয়ানা টাঙ্গানো মঞ্চের বাইরে এসে মনটা একটু শান্ত হল। একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে সিগারেট ধরালাম। সামনের দিকে তাকাতেই চোখে পড়লো– ওই তো আমার স্কুল, ওই তো পাশেই হোস্টেল। একবার ফিরে দেখার খুব ইচ্ছে হল। কেমন আছো? আমার শৈশব-কৈশোরের লীলাক্ষেত্র?

অপলক চোখে দেখতে দেখতে কোন অতীতে হাঁটতে শুরু করেছি, সম্বিত ফিরে এল রামু দত্তর ডাক্ শুনে। এই রামু দত্ত হল আমাদের স্কুলের সহপাঠী কালীচরণ দত্তর ছোট ভাই। এই শ্যামসুন্দর গ্রামেই বাড়ী। এদের বাবা গোপালচন্দ্র দত্ত ছিলেন আমাদের স্কুলের অবৈতনিক ডাক্তার। আমার গ্রামের পাশের গ্রাম তোড়কোনায় এদের কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল বা এখনো আছে। এই সম্পত্তি দেখাশুনা ও চাষাবাদের সুবাদে এর সাথে ব্যক্তিগত পরিচিতি বাড়ে।—রামু বললে– কী এত ভাবছেন? পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ছে?

–ঠিক ধরেছো। চলো একটু ঘুরে দেখে আসি।

মনে মনে ভাবলাম–পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগের দেখা জায়গাগুলোর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেই সময়কাল থেকে বর্তমানের স্থানিক পরিবর্তনের ইতিহাস আমার অজানা। এই যেখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছি– সেদিনের সেই শিশু চারাগাছটি আজ শাখা-প্রশাখায় মহীরুহ।

এই রামুদত্ত'র সাথে পরিচয়ের আরও একটি কারণ ছিল সেটা হচ্ছে, ওদের জ্ঞাতিদের সাথে বিষয় সম্পত্তি গত জটিলতা দূর করার জন্য আমাকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। তখন আমি ওই এলাকার পঞ্চায়েতের প্রধান এর দায়িত্বে ছিলাম। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮ সালের কোনো এক সময়ে ওই সম্পত্তি বিষয়ে সমাধানের জন্য আমার কাছে কয়েকবার যাওয়া আসা করেছিল।

সেটাও প্রায় তিন দশক আগের ঘটনা। এই সময় কালের মধ্যে বদলে যাওয়া সময়, বদলে যাওয়া পরিস্থিতি, বদলে যাওয়া স্থানিক প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে খুঁজে পেতে এই তরুণ প্রজন্মের কবি বন্ধুটি সহায়ক হবে। রামুদত্ত কবি নয়, কবিতা পাঠ করতেও আসেনি। হয়তো আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপনার কাজে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্বে ছিল। এতক্ষণ ধরে কবি-সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে থেকে এর গা থেকেও কবি-কবিগন্ধ বেরুচ্ছে। কবি-সাহিত্যিকদের ছোঁয়ায় সংক্রামিত কবি। তাই একে কবি বলে স্বীকার করে নিতে আমার অন্তত আপত্তি নেই। হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা পাঞ্জাবি, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, একেবারে কবি কবি ভাব। মনে মনে কবি-ভাব, ভাবে কবি– আর কি চাই?

ও জানে আমি এই স্কুলের ছাত্র, ওর দাদার সহপাঠী। এই হোস্টেলেই থাকতাম। দীর্ঘদিন এলাকায় খেলাধূলা, মেলা দেখা, যাত্রা শোনার সুবাদে বিচরণ করেছি।

আজ আবারও সেই স্কুল—সেই হোস্টেল, কিন্তু আজ আর সেই সহপাঠীরা নেই। আজ আমি একা-শুধু একা।

রামু আর একবার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—আর একবার ঘুরে দেখবেন না আপনাদের সেই লীলাভূমি? কবি বন্ধুটি বয়সে আমার থেকে নবীন হলেও কথাবার্তায় বেশ রসবোধ আছে। ওর ওই লীলাভূমি শব্দটা শুনে কেমন যেন

নস্টালজিক হয়ে পড়লাম। ফিরে দেখার উৎসাহের আগুনে যেন ঘি ঢেলে দিল। রতন, কনক, মৌসুমী, সঞ্জয় দেবাশীষের সেদিনের মুখগুলো—যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠলো। ছায়াছবির মত কৈশোরের দূরন্তপনার দিনগুলো ক্রমশ জীবন্ত হয়ে উঠছে।

সত্যিই তো সেদিনের সেই লীলাভূমির বিচরণ ক্ষেত্রটিকে আজ দর্শন না করে গেলে যে মহাপাপ হবে।—চলো এবার বেরিয়ে পড়ি। শীতের রোদ তেমন গায়ে লাগছে না; বরং ঠাণ্ডার আমেজে একটু উষ্ণতা গায়ে মাখতে ভালই লাগছে। রামু বললে, একটু দাঁড়ান দাদা, টিফিন টা খেয়ে নিই। এই বলে তার ঝোলা ব্যাগ থেকে দুটো টিফিনের প্যাকেট বের করে বললে, আগে টিফিনটা খেয়ে নিন, তার পর ঘোরা যাবে।

টিফিন খেতে খেতে দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর একটা লিষ্ট মনে মনে তৈরি করে ফেল্‌লাম।

রামুকে বললাম— তাহলে সামনের এই অডিটোরিয়াম হল থেকেই শুরু করা যাক্।

—হ্যাঁ তাই হোক বলে, রবীন্দ্র সংগীতের একটা কলি গাইতে আরম্ভ করলো— আমাদের যাত্রা হল শুরু- এখন ওগো কর্মবীর—এই পর্যন্ত গেয়ে ওর নিজের সংযোজন- 'কি আর তোমার দেখার আছে— ঘোমটা খোল এবার'।

আমি হাসি আর চেপে রাখতে পারলাম না। বাঃ বেশ ছন্দটা মিলিয়ে দিলে তো? একেই বলে স্বভাব কবি।

—হ্যাঁ এতক্ষণ ধরে আপনাদের সঙ্গে ছিলাম কিনা-তাই। এ হল সঙ্গদোষ, বুঝলেন দাদা।---কথা বলতে বলতে অডিটোরিয়াম হলের সামনে এসে হাজির হলাম।

স্কুলের অডিটোরিয়াম হল এখন কঙ্কালসার। স্কুলের কাঠামো এখনো টিকে আছে বটে, দরজা-জানালা নেই, উপরে এ্যাজবেস্টসের চাল কয়েক জায়গায় ফুটো। হলের মধ্যে পশ্চিম দিকের মঞ্চটি দীর্ঘ দিনের অব্যবহারে জীর্ণ— আগাছা জমেছে। হলের মেঝেতে ২/৩ জায়গায় গোঁজ পোতা আছে।

একটি গাইমোষ তখনও সিমেন্টের ডাবায় কাটা ঘাসের সঙ্গে খোল-ছানি-খাচ্ছে। হয়তো এটিকে কেউ গরু মোষের গোয়াল হিসাবে ব্যবহার করে।

এই অডিটোরিয়াম হলের সামনের উত্তর দিকে যে ফাঁকা প্রায় দুই-আড়াই বিঘা মাঠ ছিল, যেখানে স্কুলের কালীপদ বাবু- এন. সি. সি. প্যারেড করাতেন; কিছুটা অংশ এখনো ফাঁকা আছে। জানি না এখন সেখানে কি হয়। তবে- এখন আর এন. সি. সি. প্যারেড হয় না; আর স্কুলের ছেলেরাও ক্রিকেট বল নিয়ে ছুটোছুটি করে না।

এই ফাঁকা মাঠের উত্তর দিকে ইউ. জি.সি ক্যাম্পাস বা প্রফেসরদের কোয়ার্টার ছিল। যেখানে বহিরাগত বহুদূরবর্তী এলাকার প্রফেসাররা থাকতেন।

আমাদের এক সহপাঠী, পার্থসারথী দাশগুপ্ত-র জ্যাঠা প্রফেসর প্রিয়ব্রত দাসগুপ্ত ফ্যামিলি সহ থাকতেন। তিনি বামপন্থী মতাদর্শের লোক ছিলেন। এছাড়াও অন্যান্য ২। ৩ জন প্রফেসরও সেই সময় বামপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এম. সি. চাকলাদার, জয়ন্ত মুখার্জ্জী— এঁরা শুধু বিদগ্ধ পণ্ডিতই ছিলেন না- মতাদর্শ প্রচার ও রাজনৈতিক ক্রিয়া কাণ্ডের সাথে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিলেন। বলা যায়- এঁদের সান্নিধ্যেই আমাদের বেড়ে ওঠা, বামপন্থী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া। এক কথায় মনের বিকাশও সমৃদ্ধি ঘটেছিল এঁদের সূত্রেই। এখানে একটা বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে— তরুন স্যারই এ ব্যাপারে আমাদের পথ দেখিয়েছিলেন। বলা যায়, তিনিই এ বিষয়ে আমাদের দীক্ষাগুরু ছিলেন।

এখন এই কোয়ার্টারে প্রফেসররা থাকেন না। কোয়ার্টার কম্পাউণ্ডের ভিতরে ঢুকে দেখা গেল— কয়েকটি ঘরের দরজার বাইরে লেখা আছে সপ্তাহের কোন কোন দিন রাজস্ব বা খাজনা আদায় হয়। বোঝা গেল এটি এখন স্থানীয় পঞ্চায়েতের জমির খাজনা আদায়ের অফিস। এটা এখন চালু আছে না কোন এক সময় চালু ছিল, তা বোঝা গেল না। তবে কম্পাউন্ডের সামনের দিকে উঁচু করে হোডিংয়ে লেখা আছে— আই. সি. ডি. এস কার্যালয় (শিশু বিকাশ কেন্দ্র)।.

এই ইউ. জি. সি হোস্টেল বা প্রফেসর কোয়ার্টার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে— ফাঁকা মাঠের একটা অংশে একটি অডিটোরিয়াম হল তৈরি হয়েছে। সম্ভবত দো-তলা, তালা বন্ধ থাকায় ভিতরে ঢোকা সম্ভব হয়নি। হয়তো এটা ২০।২৫ বছর আগেই তৈরি করা হয়েছে। প্লাস্টার করা হলেও চুনকাম বা রং করা হয়নি। রামু বললে এটা তৈরি করাই হয়েছে, চালু করা হয়নি। এটা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে কেউ আছে বলে মনে হয় না।

আবারও ওই পুরানো অডিটোরিয়াম হলের পাশ দিয়ে দক্ষিণ মুখে ফিরে এলাম আমাদের স্কুল হোস্টেলের দিকে। হোস্টেলের

গেট খোলা থাকায় ভিতরে প্রবেশ করতে কোনো অসুবিধা হল না। সেই একই অবয়ব নিয়ে দোতলা হোস্টেল এখনও দাঁড়িয়ে আছে। উপরের ঘরগুলি তালাবন্ধ, নিচের ঘরগুলিও অধিকাংশ তালা বন্ধ– কেবল নিচে সিঁড়ির পশ্চিম দিকের দুটি ঘরে চেয়ার-টেবিলে চার পাঁচজন ছেলে কম্পিউটারে কী যেন কাজ করছে। হোস্টেলটি ইংরাজী E অক্ষরের আদলে তৈরি উত্তর দুয়ারী। উপর দিকে চেয়ে দেখি– একটি সাইন বোর্ড লাগানো হয়েছে– তাতে লেখা আছে 'শ্যামসুন্দর হোলি ফ্যামিলি স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম C. B. S. E।' বোঝা গেল হোস্টেল এখন রূপ পাল্টে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে এবং নিচের তলার ওই দুটি ঘরে– অফিস রুমে ওই কয়েকজন কাজ করছেন।

হোস্টেলের উত্তর দিকেই ছিল আমাদের রান্নাঘর– যেখানে রাঁধুনি আশুদা ও তার সহযোগী দু-একজন রান্না করতেন। ওদের হাতের আলু পটলের তরকারির যে স্বাদ পেয়েছিলাম তা আর কোথাও পাইনি। এছাড়া অন্যান্য পদ গুলির স্বাদ এখনো আমার মুখে লেগে আছে।

সংসার জীবনে আমার স্ত্রীকে- একথা অনেক বার বলেছি। আলু পটলের তরকারি রান্নাতে বিভিন্ন মশলার উপকরণে রান্না করার একাধিক চেষ্টাতেও সেই স্বাদ অধরাই থেকে গেছে। এই রান্না ঘরটিও ছিল– দো-তলা। উপর তলায় গোটা চারেক রুম, যেখানে মাষ্টারমশাই– ত্রিলোচন কর্মকার, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, কালীপদ বাবুরা থাকতেন।

এখন ওই রান্নাঘরের উনোনে আর ধোঁয়া ওড়েনা, নিচের তলায় দাওয়ায় বসে যেখানে আমরা আহার করতাম সেই বসার জায়গাটি আরও বসে গিয়ে– কোথাও কোথাও আগের দিনের বৃষ্টির জল জমে আছে। রান্না ঘরের উপর তলার ছাদে, কয়েকটি চারা অশ্বস্থ গাছের পাতা ড্যাং ড্যাং করে হাত পা মেলে ব্যঙ্গ করছে– ''দেখো তোমরা নেই বলেই আমাদের কতদূর বাড় বেড়েছে। তোমরা থাকলে হয়তো আমাদের জন্মই হত না। আমাদের স্থান হত আবর্জনার স্তুপে নয়তো আশুদার উনোনে।" অব্যবহারে জীর্ণ রান্নাঘর এখন চামচিকি, বাদুড়ের আঁতুর ঘর।

হোস্টেল ও রান্নাঘরের মাঝ দিয়ে পূর্ব দিকে হোস্টেলের ছেলেদের জন্য স্কুলে ঢোকার সাবেকী পথ, এখনও খোলাই আছে। স্কুল প্রাঙ্গনে ঢোকার মুখেই- যেখানে একটা বড় আম গাছের তলায় নিচু ক্লাসের ছেলেদের জন্য লোহার বিমের উপর শেকল ঝুলিয়ে ২ টি দোলনা, দুটি স্লিপার, দুটি ঢেঁকি ছিল- সেই জায়গাটিতেই একটি দোতলা স্কুল বিল্ডিং তৈরি হয়েছে যেটা এখন সায়েন্স ল্যাবরেটরি হিসাবে ব্যবহার হয়।

ছোটদের অবুঝ মনের সবুজ জায়গাটি আজ কংক্রীটের দেওয়ালে ঘেরা বিজ্ঞানের গবেষণাগার। সামনের দক্ষিণ অংশে ও হোস্টেলের গা ঘেষে পূর্ব অংশে এক ফালি জায়গায় ভলিবল খেলার গ্রাউন্ড। বিকাল হলেই ভলিবল খেলতে হোস্টেলের সিনিয়র ছাত্রদের সাথে স্যারেরাও যোগ দিতেন।

দোতলা স্কুলের আকৃতিগত গঠন ইংরাজি এল প্যাটার্নের।

পূর্ব-দক্ষিণ দোতলা অংশের উপর তলায়, অফিস ও হেড স্যারের রুম এবং মাষ্টার মশাইয়েদের বসার কমন রুম, নীচের অংশে ক্লাসরুম এবং পূর্ব-পশ্চিম অংশে দোতলায় সায়েন্স ল্যাবরেটরি, নীচতলার রুমগুলিও ক্লাস রুম। স্কুলের আকৃতিগত পরিকাঠামোর কোন পরিবর্তন হয়নি। কেবল পূর্ব দিকের অফিসরুম সহ নীচে ক্লাস রুম অংশটি নীল সাদা রঙ করা হয়েছে। স্কুল বন্ধ থাকায় মাষ্টার মশাই বা এ প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের কারোর সাথেই আলাপ করা সম্ভব হলো না। আর রামুর মুখে শুনলাম। এখন যিনি হেডমাষ্টারের পদে নিযুক্ত আছেন, তিনি আমাদের আমলের স্যার কেষ্ট বাবুর ছেলে। স্কুল চত্বরের মাঝখানে পাতাবাহারী গাছের ডিম্বাকৃতি ল্যাণ্ড স্কেলিং করা প্রার্থনা স্থলটি এখনো অমলিন, উর্ধ্বমুখী ওই গাছের পাতা ছেঁটে সমান করার জন্য এবং যাবতীয় গাছের পরিচর্যা করার জন্য একজন স্থায়ী মালী থাকতো। এখন স্থায়ী মালীর জায়গাটি ঠিকা মজুরি দিয়ে মালীর কাজ করানো হয়। এই প্রার্থনাস্থলের উত্তর দিকে নানান রঙের করবী ফুলের গাছের সমাহার সৌন্দর্যায়নে আরও একটা বিশেষ মাত্রা যোগ করে ছিল। প্রার্থনা স্থল ও করবী গাছের মাঝখান দিয়ে একফালি সরু রাস্তা—তা দিয়ে অফিস রুমের নীচের ক্লাসগুলিতে যাতায়াত করা যেত। একই সঙ্গে দুটি পিলার উপর মাচা করে মালতী ফুলের গাছ দিয়ে প্রাকৃতিক ভাবেই গেট তৈরি করা ছিল। এ ছাড়া ও প্রত্যেকটি থামের গোড়ায় টবে লাগানো গোলাপ, জুঁই, চামেলী, কামিনীরা হেসে খেলে সুগন্ধ ছড়াতো।

প্রায় দুই বিঘা জুড়ে স্কুল চত্বরটি ছোটপাতার গুল্ম জাতীয় ডুডুনিয়াম ভ্যাসিকো গাছের ঘেরা দিয়ে সাজানো কয়েকটি ভাগে ভাগ করে এক দৃষ্টি নন্দন মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। যা আমাদের অভিভাবকদের কাছেও আগত

অতিথিদের কাছে মর্ত্যের নন্দন কানন হিসাবে এ শোভা মোহিত করতো। আজ—সেদিনের সৌন্দর্য্যায়নের বিলুপ্তি ঘটেছে। অতি কাতরতায় চোখ ঝাপসা হয়ে এল। প্রার্থনা স্থলটির দিকে তাকিয়ে আরও একবার জনগণ মন ... গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করলো, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বের হল না। ধীর পায়ে পিছন ফিরে স্কুল গেটের বাইরে এসে স্কুল আসার রাস্তা ধরে মূল রাস্তায় ফেরার পথ ধরলাম। এই রাস্তাটির পূর্বদিকে কলেজ ক্যাম্পাস, পশ্চিম দিকে আমাদের হোস্টেলের ছেলেদের স্নানের পুকুর (প্রায় এক একর)। এই পুকুরে স্কুল স্পোর্টসে সাঁতার প্রতিযোগিতা হতো। এই পুকুরের মাঝখানে একটি সিমেন্টের পিলার ছিল, যা আমরা পুকুরটি সাঁতারে পারাপার করতে গিয়ে কখনও ক্লান্ত হয়ে পড়লে ওই খুটি ধরে বিশ্রাম নিতাম। মনে পড়ছে এই পুকুরের দক্ষিণ দিকে হোস্টেল সংলগ্ন- বাঁধানো স্নানের ঘাটে শুধু মাত্র স্কুল হোস্টেলের ছাত্ররা এবং হোস্টেলে থাকা স্যারেরাই নিয়মিত স্নান করতেন।

গেট থেকে মূল রাস্তায় ওঠার পর পূর্বদিকে কলেজ ক্যাম্পাস, তারও একটু পূর্বে অধুনা একটা গার্লস স্কুল তৈরি করা হয়েছে। পশ্চিম দিকে মূল রাস্তা সংলগ্ন কলেজ হোস্টেল ক্যাম্পাস। যেখানে প্রতি বৎসর কলেজ ফাংশনে খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পীরা আসতেন। কলেজ হোস্টেল ক্যাম্পাসে এলাকার সাধারণ মানুষ সহ আমরাও কেবল ওই দিনের জন্যই ফাংশন দেখতে যেতাম।

কলেজ হোস্টেলের পশ্চিম প্রান্তটি যেখানে শেষ হচ্ছে সেটি তে-মাথার মোড়, যেখানে শ্যামসুন্দরের রূপকার বিশালাক্ষ বোসের শ্বেত পাথরের আবক্ষ মূর্তি বসানো হয়েছে। যার একক অবদানে স্কুল, কলেজ, থানা, পোস্ট অফিস এবং দীঘি তৈরি হয়েছে। যার আয়তন প্রায় দুই বর্গ কিমি। তখন শ্যামসুন্দর নগর গ্রাম নামের পত্তন হয়েছে। পূর্বে নাম ছিল 'আহার বেলমা'। ১৯২৬ সালে দক্ষিণ অভিমুখে পহলানপুর (এখন আরামবাগ পর্যন্ত) যাবার রাস্তা যা বাদশাহী রোড হিসাবে পরিচিত। পূর্বদিক অভিমুখী রাস্তাটি রায়না, বর্তমানে জামালপুর কারালাঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর দিকের রাস্তা ধরে তেমাথা থেকে ২০০ - ৩০০ মিটার গেলে থানামোড়। এই থানামোড় থেকে পশ্চিম দিকে বর্ধমান যাবার রাস্তা। থানা মোড় থেকে— উত্তর দিকে ১০০ মিটারের মধ্যে রায়না থানা— যদিও এটা শ্যামসুন্দরেই অবস্থিত।

এই থানাতেই সঞ্জয়, দেবাশীষ, অসিতদের একদিনের লক আপে রাত্রি যাপন করতে হয়েছিল, থানার পুরোনো অফিসঘর ও পুলিশ ব্যারাকের এখন ভগ্নদশা। ব্যবহার হয় না। তারই দক্ষিণ দিকে একটি অফিস হয়েছে। পুরনো অফিস লাগোয়া একটি কালী মন্দির এবং দুই অফিসের মাঝখানে একটি বট গাছের চারদিকে বাঁধানো বেদীর মত। এই সঙ্গে বটগাছটির কাণ্ডটিকে খড়ের ছাউনি দিয়ে বিশ্রাম স্থলের রূপ দেওয়া হয়েছে। থানার বাউণ্ডারিও পাকা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হয়েছে। যদিও তার কয়েক জায়গা হেলে গেছে। আমরা সেই সময় ওইখানে কোন প্রাচীর দেখিনি, বেশ কিছু বাবলা গাছের বন দেখেছি।

থানামোড় থেকে সোজা উত্তর দিকে থানা যাবার রাস্তা আর সোজা পশ্চিম দিকে আড়াই মোড় বা বর্ধমান যাবার রাস্তা। এই দুই রাস্তার সংযোগস্থলের উত্তর পশ্চিম কোণেই 'রাজার মায়ের দীঘি'। দীঘির আয়তন পাড় সমেত কুড়ি বিঘার মত হবে। আমাদের সময় কালে দীঘিতে মাছ চাষ হতো না, দীঘির এক পাশে একটি ডিঙ্গি নৌকা ছিল দেখেছি। তবে দীঘির চার পাড়ে নানান জাতের ফলের গাছ ছিল। বিশেষত নানা জাতের আম, পেয়ারা, দীঘির একেবারে ধারের দিকে সারি সারি নারকেল গাছ, দু-চারটি বেল গাছ, কুল গাছও ছিল। চারদিকে পাকা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা; কেবল থানা মোড়ের সংযোগস্থলে একটি গেটে সর্বক্ষণের মালী তথা প্রহরী থাকতো। আম জনতার প্রবেশ নিষেধ থাকলেও আমাদের প্রবেশাধিকার অবাধ ছিল। যদিও প্রথম প্রথম আমরা প্রাচীরের বাইরে থেকে একে অপরের কাঁধে চেপে পাঁচিল টপকে পাঁচিল সংলগ্ন তালগাছ বেয়ে নীচে নেমে— ওই সব ফল খেয়ে আসতাম। মাঝে মাঝে মালীর খপ্পরেও পড়েছি, তবে হেনস্থা হতে হয়নি। পরে স্কুল হোস্টেলের ছেলে হিসাবে মালীর সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল এবং মালীর প্রশ্রয়ে ওই বাগানে যাতায়াত আমাদের অবাধ ছিল। মালী একটা সতর্কবাণী শুনিয়ে দিয়েছিল— দেখ তোরা যা ফল খেতে পারবি খেয়ে যাবি, নিয়ে যেতে পারবি না। তবুও 'চোরা না শোনে ধর্মের বাণী'। যা পারতাম খেয়ে তো আসতামই, গাছের ফল পেড়ে ব্যাগের মধ্যে পুরে বেঁধে নির্দিষ্ট জায়গায় পাঁচিল টপকে বাইরে ফেলে দিয়ে খালি হাতে বেরিয়ে আসতাম। মালীর চোখে আমরা বাধ্য ছেলে। আমাদের সহযোগী অন্য ছেলেরা তা হোস্টেলে নিয়ে আসতো। বছরের পর বছর বাগানে

যাতায়াত কালে কোন গাছের আম, পেয়ারা কুল, জামের কোন গাছের ফলের কিরকম স্বাদ তা আমাদের হাতের তালুর মতই চেনা ছিল। এখন ফলের গাছগুলি আর নেই। রামু বললে– বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ওই দীঘি কোন এক সংস্থাকে লিজ দেওয়া হয়েছিল। লিজ গ্রহীতা প্রথম দিকে ফলের গাছগুলি কেটে ফুলের চাষ করে, পরে সর্ষেক্ষেত। এখন ওই দীঘির দক্ষিণ পশ্চিম পাড়ে পরিত্যক্ত মুরগীর খামার। দীঘির জলে হয়তো এখনো মাছের চাষ হচ্ছে।

বর্তমানে দীঘির পাকা প্রাচীর নেই, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে। দীঘির উত্তর পূর্বকোণে শাহ মানিক পীরের আস্তানা এখনো টিকে আছে। ছোট্ট দশফুট বাই দশফুল ইঁট-সুরকিতে গাঁথা ঘরটি অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় বিরাজ করতো, সেখানে সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষ সিন্নী দিত, মানত করতো। এখন আস্তানা ঘরটির হাড়-পাঁজরা বেরোনো ইঁটগুলি কে পুরাতন অশ্বস্থ গাছটির শেকড় আষ্টেপৃষ্ঠে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরে আছে। পীরের খাদিম বা সেবক হয়তো তাদের বংশধরেরা কেউ এখনো সে দায়িত্ব পালন করে চলেছে। যদিও ওই পীরের আস্তানাটি দীঘির প্রাচীরের বাইরেই ছিল। এখন তো প্রাচীরই নেই।

তখন ফাঁকা থানা মোড়ে কোণে দোকানপাট ছিলনা। এখন ওই থানা মোড়েই কুড়ি-পঁচিশটি চা, স্টেশনারী, মুরগীর মাংস, মাছ, রড, সিমেন্টের দোকান, হয়েছে।

ওই থানা মোড়ের ঠিক উত্তর পূর্ব কোণে আজাদ মেস নামে একটি মেস ছিল। যেখানে কলেজ-পড়ুয়া মুসলিম ছেলেরা থাকতো। আমার মামাও কলেজে পড়াশুনা করার সময় ওই মেসেই থাকতেন।

আমি স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম দিকে ওই মেসেতেই বছর খানেক ছিলাম। এখন মেসটির কোনো চিহ্ন নেই। স্থানীয় দু-একজন কে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, ওইখানে একটি ছোট্ট গোডাউন করা হয়েছে। পূর্বতন মেসটির বা জায়গাটির মালিক ছিলেন পাশের গাঁ শিবরামপুর গ্রামের বিশিষ্ট মানুষ গনি মিঞা।

আবারও থানা মোড় থেকে বাজারের দিকে ফিরে চললাম। থানা মোড় ও বাজারের মধ্যবর্তী রাস্তার পূর্ব দিকে সিধু মিস্ত্রির কামার শালা। কামারশালা সংলগ্ন উত্তর দিকে। তিন ছিটেবেড়া খড়ের চালের এবং তারই লাগোয়া পূর্বদিকে এ্যাসবেসটস চালের তিন কুঠুরী ইঁটের দেওয়াল দিয়ে ছাত্রাবাস তৈরি করেছিলেন, যার ভাড়া তুলনা মূলক ভাবে আজাদ মেসের চেয়ে কম ছিল। এখানে হিন্দু মুসলমান সব ছেলেরাই থাকতো। ভাড়া কম হওয়ার সুবাদে আমিও আজাদ মেস ছেড়ে, সিধুমিস্ত্রির নব নির্মিত ইঁটের গাঁথনি প্লাস্টার করা মেসেই আশ্রয় গ্রহণ করি। খড়ের চালের ঘরটিতে কলেজ পড়ুয়ারা থাকতো, আর আমরা স্কুলের ছেলেরা ইঁটের ঘেরা এ্যাসবেসটসের ছাউনিতে। যদিও মেঝে তখন পর্যন্ত মাটি দিয়ে ভরাট করা ছিল। পরবর্তীকালে মেঝে পাকা হয়েছিল বলে জানা নেই। স্কুল হোস্টেলে তখনও পর্যন্ত মুসলিম ছাত্রদের ঠাঁই হয়নি। দেবাশীষ, সঞ্জয়, আরও অনেক সহপাঠী ও প্রগতিশীল চেতনা সম্পন্ন মাষ্টার মশাইদের মদতে স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে বাধ্য করা হয়েছিল হোস্টেলে মুসলিম ছাত্রদের প্রবেশ অধিকারের জন্য। যতদুর মনে পড়ছে এই প্রশ্নে ক্লাস বয়কট ও দু-একদিনের জন্য স্কুল বয়কটেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

এক্ষেত্রে আমরাই কয়েকজন স্কুলের মুসলিম ছাত্র সিধু মিস্ত্রির মেস থেকে প্রথম স্কুল হোস্টেলে ঠাঁই পেয়েছিলাম। যদিও সিধু মিস্ত্রির কাঁচা পাকা মেসে আমরা ভালই ছিলাম। আর সিধু মিস্ত্রিও খুব স্নেহ পরায়ণ মানুষ ছিলেন। তাঁর ভাঁড়ারে কত গল্পই না ছিল—যা আমাদেরকে তাঁর কাজের ফাঁকে ফাঁকে গল্প শুনিয়ে জমিয়ে রাখতেন। আর আমরাও সেই গল্পের আকর্ষণে তার ন্যাওটা হয়ে পড়েছিলাম। এ ধরনের মানুষ পাওয়া আজকের দিনে খুবই দুর্লভ। তিনি লোহার কাজ ও কাঠের কাজে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এমন কি পুরাতন ছাতার শিক থেকে মাছের কাঁটা বা বঁড়শী বানাতে পারতেন। দূরবর্তী গ্রাম থেকে বহু মানুষ তাঁর কাছে আসতেন। তিনি যাত্রা পালায় অভিনয় করতেন, একই সঙ্গে দু-একটি পালাও রচনা করেছিলেন। তাঁর মেসে থেকে স্কুল হোস্টেলে গিয়েছিলাম ঠিকই, তবে মাঝে মধ্যেই তার গল্পের মায়াটানে চলে আসতাম। বর্তমানে সিধুমিস্ত্রির সেই মেসের অস্তিত্ব নেই। সিধুমিস্ত্রির জায়গার অধিকাংশটাই অভাবের তাড়নায় বিক্রি হয়ে গেছে। চারপাশে অনেক বসত বাড়ি হয়েছে। তাঁরই মধ্যে কুড়ি ফুট বাই কুড়ি ফুট একটি জায়গায় কামারশালা তৈরি করে সিধু মিস্ত্রির মেজ ছেলে এখন হাপরে হাওয়া দিয়ে চলেছে। মেজ ছেলের মুখে শুনলাম মিস্ত্রিমশাই প্রায় বছর কুড়ি আগে মারা গিয়েছেন। আমরা তাঁকে মিস্ত্রিমশাই বলেই সম্বোধন করে আসছি।

সিধু মিস্ত্রির মেজ ছেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দু-মিনিট হেঁটে বাজারে এলাম। এই শ্যামসুন্দর বাজারটি পাকা রাস্তার ঠিক পূর্বদিকে একই ছাদের তলায় উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ৮/১০টি দোকান যা আগে ছিল এখনো তাই আছে। কেবল মালিকের পরিবর্তন হয়েছে, ২-১ টি দোকানের নাম পরিবর্তন হয়েছে, কোথাও বা মালিকানার পরিবর্তন ঘটেছে।

একেবারে উত্তর প্রান্তের লোহার দোকান যা 'আমাদের দোকান' নামে পরিচিত ছিল—তার পরিবর্তে অন্য সামগ্রীর দোকান হয়েছে। এছাড়া সেলুন, বইখাতা পেন, ফলের দোকান ভোলাপানের মিষ্টির দোকান, চক্রবর্তীদের কাপড়ের দোকান, সিদ্ধেশ্বর ডাক্তারের চেম্বার এবং একেবারে উত্তরে আলাদা বিল্ডিংয়ে পোষ্ট অফিস ছিল, এখনো আছে। তবে পোষ্ট অফিসের পূর্বে অর্থাৎ রায়না যাবার রাস্তার উত্তর গা বরাবর যে অংশটি ফাঁকা মাঠ ছিল, যেখান থেকে পূর্বে মাইলখানেক দূরের মুক্তিপুর গ্রাম দেখা যেত, সেই বিশাল পরিমাণ চাষের জমিতে এখন প্রচুর পাকা বাড়ি উঠেছে। ফলে আর ওই মুক্তিপুর গ্রাম দেখা যায় না। আশ-পাশের গ্রামের বধিষ্ণু পরিবারের লোকজন এসে জড়ো হয়েছেন। এখন পাকা রাস্তার ধারে এসে বসবাস করার একটা প্রবণতা বেশ কয়েক দশক চালু হয়েছে। বিশেষত যাঁরা চাকুরীজীবী তাঁদের মধ্যেই এ প্রবণতা বেশি। বাজার সংলগ্ন পিচ রাস্তার পশ্চিম দিকে থানা মোড় পর্যন্ত বহু রকম দোকানের সারি। বাজারে তেমাথার মোড়ে সেই বকুল গাছটিকে দেখতে পেলাম না। যেখানে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে কনক, রতন, মৌসুমীর সাথে আমার শেষ দেখা হয়েছিল। সে কথা মনে আসতেই মন উচাটন। প্রবল ইচ্ছে হল এই তো পাশেই 'রায়ড়া' রতনের গ্রাম, তার লাগোয়া পাশের গ্রাম 'সহজপুর' যেখানে কনকের বাড়ী, আর এই শ্যামসুন্দর বা আহার ব্যালমা গাঁয়েই মৌসুমীদের ঘর—যাই একবার দেখে আসি।

রামুকে আর আমার মনের সুপ্ত ইচ্ছের কথা গোপন করেই বললাম চলো, তোমাদের গ্রামটা একটু ঘুরে দেখে আসি। বাজার থেকে পাকা রাস্তা ধরে কলেজ হোস্টেল, কলেজ গেট পেরিয়ে গাঁয়ে প্রবেশ করলাম। গাঁয়ের ভিতর দিয়ে মূলপাকা রাস্তাটা রায়নার দিকে চলে গেছে, বর্তমানে কাড়ালাঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। গ্রামের রাস্তার ধারে বিক্ষিপ্তভাবে যে জায়গাগুলি ফাঁকা ছিল এখন সেখানে নূতন নূতন বাড়ি হয়ে গেছে। অনেক পরিচিত পুরাতন গাছগুলি আর নেই। তবে কয়েকটি বাড়ির ছাদে টবে রাখা ফুলগাছ উঁকি দিচ্ছে।

রাস্তা ধারে বেশ কিছুটা এগিয়ে- দক্ষিণ দিকে ঢালাই রাস্তা ধরে মিনিট দুয়েক হেঁটে চাতরের চত্বরে এসে পৌঁছালাম। চাতরের চত্বর খানিকটা ছোট হয়ে গেছে। উত্তর দিকে কালীমন্দিরটি নূতন করে নির্মাণ করা হয়েছে— তৎসংলগ্ন একটি সুন্দর নাম সংকীর্তনের জন্য উঁচু মঞ্চ তৈরি হয়েছে। চাতরের দক্ষিণ পশ্চিম কোনের সেই অশত্থ গাছটির দেখাও পেলাম না। যেখানে কনক-রতন মৌসুমীর সাথে জিলাপি- পাঁপড় ভাজা খেতাম। চাতরের পশ্চিম দিকে শ্যামসুন্দর মন্দির। মন্দির গাত্রে অনেক দেব দেবীর খোঁদাই করা মূর্তিগুলি এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। মন্দিরের ভিতরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি, এখনো নিত্য পূজা হয়। মন্দির প্রাঙ্গনটি পারিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মন্দিরের ভিতরে ওঠার আগেই নিচে শ্বেতপাথরে বিশালাক্ষ বোসের বংশ পরিচয় নামাঙ্কিত করা, যা আজও অক্ষুণ্ণ। মন্দির প্রাঙ্গনের উত্তর পূর্ব কোণে একটি সুউচ্চ ঘরের মধ্যে রথ আছে। প্রতিবছরই রথের চাকা খড়খড় করে গড়িয়ে চলে। রথের মেলা বসে, মেলার পরিসর চাতরের চত্বর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দোল পূর্ণিমায়, কালী পুজো উপলক্ষ্যে যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হতো, যেখানে সিধু মিস্ত্রি ওরফে আমাদের মিস্ত্রি মশাই অভিনয় করতেন। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দশফুট বাই দশফুটের শিবের মন্দির। প্রতিবছরই শিবের গাজন হয়। কয়েকদিনের জন্য শিবগোত্র লাভের লোভে নীচু বর্ণের মানুষরাও সন্ন্যাসী হয়ে যান। ফলে তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষদের বাড়িতে এই সন্ন্যাসীরাও শিবের প্রতিরূপে সমাদর পান। এমনকি উঁচু সম্প্রদায়ের বাড়ির মহিলারা পায়ে জল ঢেলে প্রণাম পর্যন্ত করেন। এই প্রথা প্রকরণ দেখে খুবই অবাক লাগে।

যাইহোক শ্যামসুন্দর মন্দির চাতরের কালী মন্দির দর্শন শেষ হলে রামুকে বললাম—আচ্ছা, মৌসুমীদের বাড়িটা কোন খানে বলো তো?

রামু– মৌসুমী! এখানে মৌসুমী বলে তা কেউ থাকে না।

আমার মনে হল হয়তো মৌসুমী নামটা ওর কাছে পরিচিত নয়। এই মুহূর্তে মৌসুমীর বাবার নামটাও স্মরণে আসছেনা। এখন নূতন নূতন বাড়ির মাঝে ওদের বাড়ির নির্দিষ্ট স্থানটি খুঁজে বের করাও মুস্কিল।

ওইখানেই দাঁড়িয়ে চোখ বুজে মৌসুমীর বাবার নামটা স্মরণ করার চেষ্টা করতে লাগলাম। নাঃ, নামটা কিছুতেই মনে পড়লো না। আমি রামুকে বললাম, দেখো ওরা কিন্তু জাত ব্রাহ্মণ ছিল। পদবীটা সম্ভবতঃ ভট্টাচার্য মনে হচ্ছে।

রামু– ওঃ হ্যাঁ, ওই দিকটায় ভট্টাচার্য জ্যাঠার বাড়ি। আপনি সনৎজ্যাঠার বাড়ির কথা বলছেন?

আমি বললাম—হ্যাঁ হ্যাঁ সনৎ ভট্টাচার্য। ওই সনৎ ভট্টাচার্যের মেয়ের নাম মৌসুমী। চলো, ওদের বাড়ি দিয়ে একটু ঘুরে আসি। রামু একটা সরু রাস্তা দিয়ে সনৎবাবুর বাড়ির সামনে এনে হাজির করালো। বাড়ির সামনের দরজা খোলাই ছিল, সোজা উঠানে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি এক বয়স্ক মহিলা দাওয়ায় বঁটিতে আনাজ কুটছেন। রামু বললে, উনি সনৎ জ্যাঠার স্ত্রী। জাঠাতো বছর পনের আগেই মারা গেছেন। জ্যাঠার পেনশনের টাকাতেই উনার সংসার চলে। সংসারে তো আর কেউ নেই, একা মানুষ। আমার দিকে দেখে সবিস্ময়ে বঁটি ছেড়ে, মাথা কাপড় একটু টেনে নিয়ে তাকালেন। আমি বললাম—কেমন আছেন মাসীমা? চিনতে পারছেন?

মাসীমা– না তো বাবা।

আমি পরিচয় দিয়ে বললাম, রতন কনকদের সাথে আপনাদের বাড়িতে আসতাম। তখন আমি স্কুল হোস্টেলে থাকতাম, পাল পার্বণে এসে ওই দাওয়াতে এসে কতবার খেয়ে গেছি।

মাসীমা– ও, তা হবে। উদাস চোখে স্মৃতির টুকরা ঘেঁটে চেনার চেষ্টা করতে লাগলেন। চিনতে পারছেন বলে মনে হলো না। বিগত ৪৫/ ৫০ বছরে আমাদের মতো কত ছেলেই এখানে এসে পাত পেড়ে খেয়ে গেছে তার হিসাব রাখা বা চিনে রাখা সম্ভব নয়। আর এই বয়েসে স্মৃতিও এখন সায় দেয় না।

মাসীমা একটা আসন পেতে দিয়ে বললেন—বোসো বাবা, একটু চা করে দিই।

আমি– না না মাসীমা, আমরা বাজারে এইমাত্র চা খেয়েই আসছি। আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আচ্ছা মাসীমা, মৌসুমী কোথায়? আমার প্রশ্ন শোনার পর উনি কিছুক্ষণ বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলেন। উনি আঁচল দিয়ে চোখ মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন। কিছুক্ষণ পর ধরা গলায় বললেন– কনক চলে যাওয়ার পর মেয়েটার কী যে হল, কোথায় গেল, কোথায় আছে, আদৌ বেঁচে আছে কিনা জানি না বাবা।

আমি মাসীমার দিকে তাকাতে পারছিলাম না। মাথাও নীচু হয়ে এসেছে। কোন রকমে আবারও একবার মাসীমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম—কনক চলে গেছে মানে?

মাসীমা– কনক আর এ দুনিয়াতে নেই বাবা, কবেই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। আর আমার মেয়েটা, আর কিছু বলতে পারলেন না। একথা শোনার পর আর ওখানে থাকতে ইচ্ছে করছিলো না। বুকের ভিতর চিন্ চিন্ করে উঠল, সব কিছু ফাঁকা ফাঁকা, শুধু এক শূন্যতা ক্রমে ক্রমে গ্রাস করছিল।

কোনোমতে মাসীমাকে আসি বলে আবারও রাস্তায় পা রাখলাম। রামুকে বললাম—তুমি বাড়ি ফিরে যাও। আমাকে এখন একটু একা থাকতে দাও। এই বলে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। রামু বললে—দাদা, আমাদের বাড়িতে একটু খাওয়া-দাওয়া করে যাবেন না?

আমি– না, পরে একদিন তোমার বাড়িতে খেয়ে যাবো।

মৌসুমীর ব্যাপারে মাসীমার অব্যক্ত অভিব্যক্তিতে আমার মনে অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এলো, কী হয়েছিল মৌসুমীর? কীভাবে হারিয়ে গেল? কীই বা গতি হলো। আদৌ সে ইহজগতে আছে কি না। কনকের মৃত্যুর সাথে মৌসুমীর অর্ন্তধান রহস্যের সম্পর্কই বা কী? এ সব প্রশ্নগুলো মাথায় ঘুর পাক খাচ্ছে। মনে হলো এতদূর যখন এসেই পড়েছি, তখন কনকের বাড়ি গেলে হয়তো এ রহস্যের সমাধান সূত্র মিলতে পারে। এই ভেবে পাশের গ্রাম সহজপুর, কনকের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। খুঁজে পেতে কনকের বাড়ির হদিস পেলাম ঠিকই কিন্তু পুরাতন বাড়ির দরজায় তালা ঝোলানো। দেখে মনে হলো, এ বাড়ির দরজা বহুদিন খোলা হয়নি। পাশে একটি দোতলা পাকা বাড়ির রকে মাঝ বয়সী একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে জানা গেল কনকের বাবা অর্থাৎ অমল চ্যাটার্জী ও তাঁর পরিবারের কেউ এখানে আর থাকে না। কনকের মৃত্যুর পর অমলবাবু তাঁর অপুত্রক বোনের বাড়িতে বসবাস করতেন। উনি বললেন-বর্তমানে—অমলবাবু ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই মারা গেছেন। আর ওদের বাড়িঘর আমিই দেখাশুনা করি। এই কথা বলে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি বললাম আমি কনকের সহপাঠি স্কুল হোস্টেলে থাকতাম। স্কুলে পড়াশুনা কালীন কয়েকবার কনকদের বাড়িতে এসেছিলাম। তাই মনে হলো এদিকে যখন এসেছি তখন পুরোনো বন্ধুর একটু খোঁজ নিয়ে যাই।

উনি জানতে চাইলেন—আচ্ছা, আপনি কি রতন, কনক, দেবাশীষ সঞ্জয়ের ব্যাচ?

আমি বললাম—হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন আমিও সেই ব্যাচেরই। মনে হলো উনি যথার্থই আমাকে চিনতে পেরেছেন। আমাদের নীচু ক্লাসের ছাত্র ছিলেন বলেই হয়তো আমি চিনতে পারিনি। এটাই স্বাভাবিক ২/৪ ক্লাসের নিচের ছাত্রদের উপরের ক্লাসের ছাত্রদের চেনা সম্ভব না হলেও উঁচুক্লাসের ছাত্রদের স্কুলের প্রায় সব ছাত্ররাই চেনে। তার উপর আমাদের মতো মোড়ল- মাতব্বর ছাত্রদের এক কথায় সবাই চিনতো। ইনি কনকের খুড়তুতো ভাই বলে পরিচয় দিলেন। এসব কথাবার্তার মাঝেই বাড়ির ভিতর থেকে মহিলা কণ্ঠের ডাক—একবার বাজার যেতে হবে, আলু ফুরিয়েছে। পিয়াঁজও অল্পই আছে, পারলে একটু সবজিও এনো। এক ভদ্রমহিলা বাজার করার থলি নিয়ে এসে উনার হাতে ধরিয়ে দিলেন। কনকের খুড়তুতো ভাই বললেন—একটু বাজার যেতে হবে। কিছু মনে করবেন না, নইলে আর একটু গল্প করা যেতো।

আমিও বললাম—ঠিক আছে আপনি বাজার করুন। গৃহী মানুষদের এই এক জ্বালা। ঠিক সময়ে গৃহিণীদের কাছে সব জিনিস না এনে দিলে গোটা বাড়িই গরম হয়ে উঠবে। আচ্ছা চলি, আবারও পথে নেমে এলাম। এবার গন্তব্য রতনের বাড়ি—লাগোয়া গ্রাম রায়ড়া। দেখি ওখানে গিয়ে আবার কী নূতন দৃশ্য দেখতে হয়। মূল পাকা রাস্তাটি সহজপুর ও রায়ড়া গ্রাম দুটিকে চিরে রায়ড়ার দিকে চলে গেছে। একদিকে সহজপুর কনকদের গ্রাম অন্যদিকে রায়ড়া রতনদের গ্রাম। রাস্তা না থাকলে হয়তো এ দুটো গ্রামকে পৃথকভাবে চেনা যেত না। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি গ্রামই মূল রাস্তার সাথে যুক্ত হয়েছে। বামফ্রন্টের আমলে মোরাম- বোল্ডার দিয়ে যা দাগ কাটা হয়েছিল এখন তা পাথর, সিমেন্ট, বালি দিয়ে ঢালাই রাস্তা করে দাগ বোলানো হয়েছে।

স্কুল হোস্টেলে থাকা কালীন বেশ কয়েকবার রতনের বাড়ি এসেছি। মূলত ঈদ- বকরীদের পরবের সময়, সিমুই, পোলাও কষা মাংস খেতে। বিশেষত রতনের মায়ের হাতের কষা মাংসের লোভে আমি দেবাশীষ, সঞ্জয়, অমিত মুখিয়ে থাকতাম। এছাড়া রায়ড়া গ্রামের গফফার চাচার কথা মনে পড়ছে, যার বাজারে একটি রুটি বিস্কুটের ফলের দোকান ছিল। প্রতিমাসের রবিবারের দু- একদিন গফফার চাচাকে অর্ডার দিয়ে গফফার চাচীর হাতে গড়া রুটি ও কষা মাংস আনতাম। সেদিন কারমত হোস্টেলে রাতের মিল অফ করে- গফফার চাচার দোকানে বসেই মাংস-রুটি খেয়ে হোস্টেলে ফিরতাম।

রতনের বাড়ি খুঁজতে একটু সমস্যা হয়েছিল। রাস্তা সংলগ্ন ফাঁকা জমি পুকুর পাড় ও পতিত জায়গা গুলিতে তে বেশি ঘর বাড়ি হয়েছে সেই সঙ্গে ছোট বড় গলি রাস্তার এত বেশি আধিক্য হয়েছে যে রতনের বাড়ির স্থানকেও খুঁজতে বারে বারে হোঁচট খেতে হচ্ছে। দশ- বিশ পা এগিয়েই- জিজ্ঞেস করতে করতে রতনের ভিটেয় এসে পৌঁছালাম। বাড়ির চারদিক পাকা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দোতলা পুরানো সেই পাকা বাড়ি এবং সদর দরজা সংলগ্ন খড়ের চালের মাটির দেওয়ালের বৈঠকখানা। দেওয়ালগুলি ঘষে মেজে নূতন রূপ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকখানায় উপরে কড়িকাঠে ইলেট্রিক ফ্যান লাগানো হয়েছে। দেওয়ালে ইলেট্রিক বাল্ব লাগানো হয়েছে যা বর্তমানে নূতন সংযোজন। বৈঠক খানার নীচে বসে একজন লোক বিড়ি খাচ্ছেন। সম্ভবত এ বাড়ির কাজের লোক। ওকেই রতনের বাবার কথা জিজ্ঞেস করাতে বললেন—হ্যাঁ, ওই তো উনি বৈঠক খানার ভিতরে তক্তায় বসে রেডিও শুনছেন।

আমি রতনের বাবার কাছে তক্তো পোষের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কেমন আছেন চাচাজী? প্রশ্ন শুনে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হয়তো চিনে উঠতে পারছেন না। খেই ধরিয়ে দেবার জন্য আমার পরিচয় দিলাম, একই সঙ্গে আমাদের সঙ্গী সাথীদের এ বাড়িতে আসার কথাও বললাম। কিন্তু কিছুতেই ওকে মনে করাতে পারছি বলে মনে হল না। প্রত্যুত্তরে উনি যা বললেন তা শুনে তো আমারই মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। উনি বললেন—ওঃ তা হবে। আচ্ছা রতন কী করছে বলো দেখি? সেই যে চাকরি করতে গেল আর ফেরার নাম নেই। বিয়ে যে করলি, বৌটাকে ঘরে আনতে হবে তো, নাকি বলো?

এমন সময় অন্দর মহল থেকে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, হাতে মুড়ির থালা ও শশা কুচোর বাটি। আমাকে দেখে একটু ইতস্ততবোধ করলেন। একটু পরেই স্বাভাবিক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না। আমি বললাম—আপনাদের বাড়ি ছেলেবেলায় স্কুলে পড়ার সময় কতবার এসেছি। রতন আমার স্কুলের বন্ধু। সবিস্তারে আমাদের নাম পরিচয় দিতেই উনি বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। সে কতদিনকার কথা বলুন দেখি। বয়সের সাথে রং

রূপের কত পরিবর্তন হয়েছে, চট্ করে চেনা মুস্কিল। আমি রতনের ছোট ভাই যতন। বাবার কথা জিজ্ঞাসা করাতে যতন বললে, বাবার বিরাশি বছর হলো। কানে কম শোনেন। চোখেও ভাল দেখতে পান না, স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন। অ্যালজাইমায় আক্রান্ত। অনেক সময় আমাকেও চিনতে পারেন না, আবার অনেক সময় পুরানো দিনের কথা হুবহু বলে যান। বহু চিকিৎসা করিয়েছি খুব একটা লাভ হয়নি। এখন ওই রেডিও দেখছেন, ওটা নিয়েই ওই বৈঠক খানাতেই পড়ে থাকেন। রেডিও বেজেই চলেছে, আদৌ শোনেন কিনা বা শুনতে পান কিনা বলতে পারবো না। হয়তো কিছুক্ষণ আগে ভাত খেয়েছেন, আবার কিছুক্ষণ বাদেই বলছেন—কইরে আমাকে ভাত দিবি না?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—চাচীমা কেমন আছেন?

যতন– মা ভালোই আছেন, তবে হাঁটুতে বাতের ব্যথার জন্য কষ্ট পাচ্ছেন।

আমি– চাচীমার সাথে একবার দেখা করতে চাই।

যতন– হ্যাঁ, আসুন না। এই বলে যতনের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে গেলাম। চাচীমা নক্সী কাঁথায় তখন ফোঁড় তুলছেন। বয়সের ভারে চোখে চশমা উঠেছে এবং শরীরও ভারি হয়েছে। যতন বললে, মা দেখ কে এসেছে, চিনতে পারো কি না দেখ। চাচীমা আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। আমাকে বললেন—না বাবা, ঠিক চিনতে পারছি না।

যতন– মা, ইনি আমার বড় ভাইয়ের স্কুলের বন্ধু। সেই সময় আমাদের বাড়িতে আসতেন। সবিস্তারে আমার পরিচয় দিলে চাচীমা বলে উঠলেন—হ্যাঁ বাবা, এবার বুঝতে পেরেছি। চিনতে আর কি করে পারবো বলো? আমাদের তো না হয় বয়স হয়েছে, আর তোমার তো চুলে পাক ধরেছে। সেই অল্প বয়েসের মুখের আদল লাবণ্য তো আর নেই। কেমন আছো বাবা? এতদিন পর আমাদের কথা মনে পড়লো? বিয়ে- থাওয়া করেছো নিশ্চয়ই।

আমি– বিয়ে থাওয়া কি বলছেন, আমার নাতি নাতনীদের বিয়ে দেওয়ার সময় হয়ে এল।

চাচীমা– তাহলে তুমিতো অনেক বড় হয়ে গেছ, ভালো ভালো, বাড়ির সবাই কেমন আছে? একদিন সবাইকে নিয়ে চাচীমার বাড়িতে বেড়াতে এসো না।

আমি বললাম– হ্যাঁ, অবশ্যই নিয়ে আসবো। একবার যখন ঠিকানা খুঁজে পেয়েছি অবশ্যই আসবো। একটু পরেই যতনের স্ত্রী লুচি আর মিষ্টি নিয়ে এল। যতন তার স্ত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। যতনের ছেলে বাঙ্গালোরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশুনা করেছে এবং মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। যতন নিজেও গত বছর স্কুল মাষ্টারির চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে বাড়িতেই। জমিজায়গা দেখাশোনা ও বৃদ্ধ মা-বাবাকে দেখাশুনা করা, স্বামী-স্ত্রী মিলে আপাতত চারজনের সংসার। জলযোগ সেরে চা খেয়ে চাচীমাকে প্রণাম সেরে বললাম চাচীমা, এবার আমায় ফিরতে হবে।

যতনের স্ত্রী বললো সে হবে না দাদা, এসে যখন পড়েইছেন তখন এবেলা দুমুঠো ভাত না খাইয়ে ছাড়ছি না। এই মেয়েটির আবেদন এতটাই মাধুর্য্য মণ্ডিত যে চট্ করে না বলা যায় না। হয়তো এই পরিবারটির সঙ্গে কোথাও একটা আত্মিক সম্পর্ক সূত্রের টান এখনো অনুভব করছি। এমনি করেই সেই স্কুল বেলায় যখন রতনদের বাড়ি আসতাম, চাচীমা ও ঠিক এমনি করেই আপ্যায়ণ করে খাওয়াতেন। যতনের বৌ বোধ হয় সেই ঐতিহ্যই বহন করে চলেছে।

আমি– না, আজকে আর খাবো না বৌমা। একদিন সপরিবারে এসে ভুরিভোজ করে যাবো, আমন্ত্রণ তোলা রইল।

যতনের স্ত্রী– সে সৌভাগ্য কি আর আমাদের হবে দাদা? ঠিক কথা দিলেন তো?

আমি– না, তোমার কথা ভোলার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে কবে আসবো এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। এমনি করেই হয়তো কোন একদিন হঠাৎ করেই হাজির হয়ে যাবো। এবার চাচীমাকে জিজ্ঞেস করলাম—রতন এখন কোথায় আছে? রতনের নাম নিতেই কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করলেন। পাঁচ সেকেণ্ড কি যেন ভাবলেন। অস্বস্তি কাটিয়ে বললেন, ছেলেটা কোথায় আছে, কী করছে কিছুই জানি না বাবা। এ বাড়ির সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই। শুনেছি কোথায় চাকরি করে, হয়তো সেখানেই কোথাও আছে। কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল—সবই আমার কপাল। চোখে চশমার ফাঁক গলে জল বেরিয়ে এল, আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন।

আমিও খানিকটা হতভম্ব। হয়তো রতনের কথা জিজ্ঞাসা করে খুব নরম জায়গায় আঘাত করে ফেলেছি। তাহলে রতনও কি নিরুদ্দেশ হয়ে গেল? বাবা- মার সাথে সম্পর্কের চিড় ধরলো কেন? রতনকে যতদূর চিনতাম তাতে এতটা স্বার্থপরতা তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল? এতো ভাবতেই পারছি না। একটু আগে

যে মনের উৎফুল্ল ভাবটি ছিল এ কথা শোনার পর নিমেষে তা নিভে অন্ধকার। চাচীমার মনের এ অবস্থা দেখে আর কিছু প্রশ্ন করতে মন চাইছিল না। কোনরকমে রতনদের বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলাম। দেখি যতনও আমার পিছু পিছু আসছে।

যতন রতনের থেকে বছর আষ্টেকের ছোট। সে কারণে ওই সময় আমাদের সঙ্গে পরিচয়ের ক্ষেত্র উহ্য ছিল। যতন বললে, চলুন দাদা, আপনাকে রাস্তার বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত আগিয়ে দিয়ে আসি।

মনে মনে ভাবলুম রতন সম্পর্কে যতন নিশ্চয়ই কিছু জানে। এর কাছে নিশ্চয়ই কিছু হাল- হদিস জানা যেতে পারে। বললাম—এসো। মিনিট পাঁচেক হেঁটে বাসস্ট্যান্ডের গাছের তলায় হাজির হলাম। বাস আসতে তখনো আধ ঘণ্টা দেরি। এবার আমি কথাটা তুললাম। আচ্ছা যতন একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, যদি কিছু মনে না করো।

যতন– হ্যাঁ বলুন না।

আচ্ছা রতনের বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কারণটা কি?

যতন– তখন আমি ক্লাস ফাইভের ছাত্র। বড় ভাই সবে মাত্র বর্ধমানের কোন এক মফফ্সল গঞ্জ এলাকায় ব্যাংকে চাকুরিতে ঢুকেছেন। মাসে একবার করে বাড়ি আসতেন। বাড়িতে থাকাকালীন বড় ভাইয়ের বন্ধু কনকদার বাড়িতে যাওয়া চাই-ই। কনকদাও আমাদের বাড়িতে আসতো। কনকদা পাশের অঞ্চলে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। শ্যামসুন্দরের সনৎ ভট্টাচার্যের মেয়ের সাথে কনকের বিয়ে হয়। আমার বাবাই এ বিয়ের মূল হোতা। আপনি হয়তো জানেন, কনকের বাবা, সনৎ ভট্টাচার্য এবং আমার বাবা তিনজনে খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রে কনকদার বিয়েতে আমরা সপরিবারে নিমন্ত্রিত ছিলাম। যদিও তখন বয়সে অনেক ছোট। দেখেছি বড় ভাই কনকদার বিয়েতে দিন পাঁচ- ছয় ওদের বাড়িতে থেকে কনকদার বিয়ের যাবতীয় দায়িত্ব নিয়ে বৌভাত খেয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। এমন কি কনকদা বৌ নিয়ে আমাদের বাড়িতেও একদিন কাটিয়ে গেছেন।

সেবার হলো কি দূর্গাপুজার সময় পুজো মন্ডপের প্যান্ডেলে ইলেকট্রিক বাল্ব দিয়ে আলোকসজ্জা করা হবে। কাছের বিদ্যুতের খুঁটি থেকে হুক করে বিদ্যুৎ সংযোগ করতে কনকদা বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন। কনকদার এই হঠাৎ মৃত্যুতে বড় ভাই ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। হাসি খুশি ভাব উধাও হয়ে গিয়েছিল। খুব প্রয়োজন না হলে খুব একটা কথা বলতেন না। চাকরিস্থল থেকে বাড়ি আসাও ক্রমে ক্রমে কমে আসছিল। বাড়িতে এলেও কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকতেন। হয়তো কখনো কখনো কনকদার বাড়িও যেতেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসতেন। মাকে বলতেন, কনকের বাড়ি গিয়ে টিকতে পারছি না। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কনকের বৌকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা কী অবস্থায় আছে কে জানে। এই ঘটনার বছর দুয়েক বাদে বড় ভাই একদিন রাত্রির দিকে বাড়িতে এল। রাত্রের খাওয়া দাওয়া সেরে বাবা- মাকে ডেকে বলল—তোমাদের সাথে আমার একটা কথা আছে। বড় ভাই যেন কথাটা বলতে ইতস্তত করছে, ফর্সা মুখ থম্ থমে কালি মাখানো। দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে কোন রকমে বললে—আমি একটি বামুনের বিধবা মেয়েকে বিয়ে করতে চাই, তোমাদের অনুমতি নিতে এসেছি।

মা ও বাবা—কি বলছিস? বিধবা তাও আবার বামুনের মেয়ে?

বাবা বললেন– দেখ, সমাজটা এখনো অতখানি এগোয়নি। তাছাড়া আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী তারা কি ভাববে। নাঃ এরকম বিয়েতে আমার মত নেই। মা বললে—এটা হতে পারে না, আমরা তো সমাজ ছাড়াতে পারবো না। তুই এসব চিন্তা ভাবনা ছাড়।

বড় ভাই– ওঃ তাহলে তোমাদের মত নেই।

বাবা/মা– তোকে লেখাপড়া শিখিয়ে এ রকম মানুষ তৈরি করেছি। বড় ভাই বললে, তোমরা যে শিক্ষায়, আদর্শে মানুষ করেছো সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই একথা বলছি। সবাই গুম হয়ে রইল, সে রাত্রে আর কিছু কথা হলো না। যে যার ঘরে শুতে চলে গেল। সকালে স্নান করে চা বিস্কুট খেয়ে চাকরি স্থলের উদ্দেশ্যে সেই যে গেল আর ফিরলো না। কয়েকমাস পর বাবা খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন যে ব্যাঙ্কে কাজ করতেন বদলি হয়ে অন্য কোথাও চলে গেছেন। এসব কথা শুনতে শুনতেই বাস এসে গেল। যতনকে 'আসি' বলে বাসে উঠে পড়লাম। যাক তাহলে এ যাত্রায় কনক, রতনের কিছুটা হলেও ইতিকথা জানা গেল। এখনো মৌসুমী অধরাই থেকে গেল।

(ক্রমশ)

ইন্তেকাল

জারিফুল হক

উটকো ঝামেলা ভাল্লাগে না। কদিন বাদেই মুরুব্বী বাবা আবার ফিরে এলেন। একবাক্স মিষ্টি কনকের হাতে দিয়ে বললেন,"কিরে মা ভালো আছিস তো সব?"

"ভালো, আপনি ভালো আছেন?" মৃদু হেসে পাল্টা জিজ্ঞেস করে কনক। কনক হাসল বটে, কিন্তু সে খুশি হয়েছে কিনা বোঝা গেল না।

মুরুব্বীবাবার তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। তিনি জানেন তাঁর এই এই বেটির কাছে কটাদিন আরামের আশ্রয় পাক্কা। দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে হেসে জিজ্ঞেস করেন, "আমার দিদিভাই কোথায়, তাকে দেখছি নাতো?"

কনক উত্তর দেয়, "ঘরেই রয়েছে, পড়ছে।"

" কেন কেন , পড়ছে কেন, শুনলাম যে চাকরি পেয়েছে সে?"

" বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে ডাটা এ্যান্টি অপারেটরের কাজ পেয়েছে। কিন্তু চাকরির পরীক্ষাগুলো দিয়ে আরো বড় চাকরি পেতে চায় সে।"

" তা বেশ। তবে আমি বলি কি, মেয়ে বড় হয়েছে একটা ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দে এবার।"

"মার কথা শুনলে তবে তো! সারাক্ষণ শুধু পড়া আর পড়া। পড়া ছাড়া আর কিছু ভাবনা নেই তার।"

"তা বললে হয়, সমস্ত মেয়ে বাড়িতে ফেলে রাখতে নেই।"

মনামী ঘরেই ছিল। মুরুব্বীবাবার সঙ্গে মায়ের কথোপকথন সবই কানে ঢুকছিল তার। মনামী খুব বিরক্ত হয়। এসব ফালতু কথা ভালো লাগে না তার।

মাসখানেকও হয়নি মুরুব্বীবাবা ওদের বাড়িতে থেকে গিয়েছিলেন। আবার এলেন।

ফকিরমানুষ পাড়া ঘুরতে ঘুরতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, কেউ কাছে ঘেঁষেনি। নিজের বাড়িতে এনে ফকিরবাবার সেবা শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করে তুলেছিল কনক। জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছিল বড়ঘরের মানুষ তিনি, ছেলেরা দেখে না। তাই নিজের ব্যবস্থা নিজে দেখে নিতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন।

মা রেঁধে বেড়ে খাওয়াচ্ছে, জামা-কাপড় কেচে দিচ্ছে। ফোকটে থাকা-খাওয়া মিলছিল। তাই নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে যাবার কোনো হেলদোল দেখায় না বুড়ো। আপদ বিদেয় করতে আসরে নামতে হয়েছিল মনামীকে। বাথরুম নোংরা করছেন বুড়ো, বেশ কড়া কড়া কথা শোনাতে তবে কাজ হয়েছিল।

এই বুড়োভাম আবার কেন ! মায়ের দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকায় মনামী। মেয়ের ভাবগতিক বুঝে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কনক বোঝাতে চেষ্টা করে,"বুড়ো মানুষ, মনে কষ্ট পাবেন, কিছু বলিস না।"

মায়ের দৃষ্টি উপেক্ষা করে মনামী জিজ্ঞেস করে,"আবার কী মনে করে?""

বুড়ো হাসতে হাসতে বললেন, "তোদের ভালোবাসার টান অনুভব করছিলাম তাই স্থির থাকতে না পেরে আবার এসে পড়লাম।"

মেয়ে কি বলতে কি বলে ফেলে, এই ভেবে কনক বলল "তুই ভেতরে যা, পড় গে যা।"

"পড়ার পরিবেশ নষ্ট হলে পড়ায় মন বসবে আমার?"

মেয়েকে মৃদু ভর্ৎসনা করে কনক বলল, "বাজে বকিস না। দুয়ারের এক কোনায় পড়ে থাকে তোর দাদু। সে চেঁচামেচি করে নাকি যে তোর অসুবিধা হবে?"

মনামী চুপ করে গেল। মুরুব্বীবাবা বললেন,"দিদিভাই আজ অফিস যায়নি কেন?"

কনক বলল-"আজ নেতাজি বার্থডে, অফিসে ছুটি রয়েছে।

"তা বেশ, আয় দিদি একটু বসে গল্প করি।"

মায়ের উদ্দেশ্যে শ্যেন দৃষ্টি হেনে মনামী প্রশ্ন করল," কোন কুলের দাদু উনি! বাপের কূলের না মায়ের কূলের?"

মা বলল," কি হচ্ছে কি! দাদুর বয়সী কাউকে দাদু বললে অসুবিধা কিসের তোর?"

"বাথরুম নোংরা করলে আমি কিন্তু ছেড়ে কথা বলবো না। বলে রাখছি মা।"

মুরুব্বীবাবার কাছে মাফ চেয়ে নেয় কনক। বলে, "ওর কথায় কিছু মনে করবেন না বাবা। বিয়ের কথা বলছিলেন তো, তাতেই মেয়ে মাথা গরম করে ফেলেছে। বিয়ের কথা বললে আমাকেও ছাড়ে না মেয়ে। আপনি হাত-মুখ ধুয়ে নিন, কিছু খেতে দিই আপনাকে।"

"না না ছোটদের কথায় কি আর মনে করবো আমি!"

মনামী বলল, "মনে করলে আপনারই লোকসান যে! তাই না দাদু?"

"সে যা বলেছিস দিদি।"

"আমি ঠিকই বলি। আমার মা বিধবা মানুষ, আরও একটা বাড়তি লোকের খাবার জোগাড় করবে কিভাবে তা ভেবেছেন কিছু?"

কনক মেয়েকে শাসন করে বলে, "মানুষটা কতই বা খান, তুই খাবারের খোঁটা দিচ্ছিস?"

মুরুব্বীবাবা বললেন, "আমি যদি খরচা দিয়ে খাই তাহলে তো তোর আপত্তি নেইতো?"

"এটা হোটেল নয়, আর আমরাও কোনো বিশেষ পেইংগেস্ট রাখছি না। একটা দুটো দিন হলেও কথা ছিল। বারবার এসব আদিখ্যেতা বরদাস্ত করবো না আমি।"

"আচ্ছা আচ্ছা বেশ, একটা দুটো দিন থেকেই চলে যাব আমি।" মুরুব্বীবাবা চুপ করলেন।

কনকের ভীষণ অস্বস্তি হয়। মেয়েটা চোটপাট বলে দিল। বুড়ো মানুষটা একটু ভালোবাসা পেয়ে এখানে এসেছেন। ফকির মানুষ ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন। মুসলমান হয়েও ওদের ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়েন ওদের ঘরে। নামাজ পাটিতে বসে কত কত দোয়া করেন তিনি। এসব কি দেখে না মেয়েটা? নিজের মাকে দেখছে মনামী! কেউ বিপদে পড়লে কে আপন কে পর তা ভাবে না কনক। তার মেয়ে এত নিষ্ঠুর হল কেন?

দাদু নামাজ পড়বেন, অজু করার পানি এগিয়ে দেয় মা। দুয়ারের ক্যালেন্ডারে কালী-কৃষ্ণ-দুর্গা মহাদেব গণেশের ছবি। সেগুলো উল্টে দেয় কনক। দেওয়ালে ছবি থাকলে নামাজ হয় না। দাদু বলেছেন সে কথা। তাই ক্যালেন্ডারগুলো উল্টে উল্টে রাখে আবার নামায হয়ে গেলে সোজা করে দেবে কনক। মনামী মাকে বলেছে, "এসব একদম ভালো লাগেনা আমার। কাছেই মুসলমান পাড়া, সেখানে মসজিদ রয়েছে, গিয়ে নামাজ পড়ে আসতে বলছ না কেন বুড়োকে।"

কনক বলে, "বুড়োমানুষ অতটা যাবার ঝক্কি পোহাতে পারবে না। ঘরে পড়ছে পড়ুক। এতে গৃহস্থের কল্যাণ হয়।"

বাড়িতে একটা মুসলমানকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। পাড়ায় গুঞ্জন শুরু হয়েছে। হিন্দুর ঘরে নামাজ পড়ে লোকটা। কনক এটা-ওটা রান্না করে খাওয়ায় তাকে। কে জানে, বিফ খেতে চায় কিনা ! কনককে বিশ্বাস নেই , কেউ মুখ ফুটে চাইলে না করবে না কনক।

পাড়ায় মুরুব্বীবাবাকে নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হল। কারো মতে পাড়ায় একজন পরহেজগার মানুষ এসে রয়েছেন। এতে লোকের ভালো হবে। কেউ আবার কট্টরপন্থী। এই বিধর্মীকে হটিয়ে দিতে কতক্ষণ! কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না কনকের জন্য। পাড়ার সবাই কিছু না কিছু ভাবে কনকের কাছে উপকৃত।

তবুও মানুষটাকে নিয়ে পাড়ায় অসন্তোষ তৈরি হচ্ছিল। সন্ধের নামাজ পড়ছিলেন মুরুব্বীবাবা। তখনই কয়েকটা ছেলে ওদের ঘরের সামনে এসে চেঁচিয়ে বলে গেল 'জয় শ্রীরাম'। এক্কেবারে অকারণে, কোনো কারণ ছিল না। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের মিছিল ছিল না সে সময়। কোনো ধর্মীয় ভাবাবেগ থেকে বলা হয়নি। অন্যকে উত্ত্যক্ত করতেই 'জয় শ্রীরাম' বলা। বৃদ্ধ হাসেন। বলেন- "বলুক না, ওরাও ভগবানকে ডাকছে। যে রাম সেই যে রহিম।"

মুরুব্বীবাবা জনপ্রিয় হচ্ছিলেন। পাড়ায় কারো অসুখ বিসুখ হলে মেয়েরা আসতে লাগল বৃদ্ধের কাছে। জলপড়া, তেলপড়া, দোয়া পড়ে গায়ে ফুঁক দেয়ার কাজ করে মুরুব্বীবাবা ক্রমশ পীরের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হতে লাগলেন। সরল বিশ্বাসে মা সবকিছু সহ্য করলেও মনামীর এই সব ভণ্ডামি মনে হতে লাগল। বাড়িতে মহিলাদের আনাগোনা অসহ্য লাগছিল তার।

মায়ের সঙ্গে প্রবল বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ল মেয়ে। বলল, "বাড়িটা পীরের আস্তানা বানিয়ে ফেলেছ তুমি।"

কনক বলল, "মানুষের উপকারে লাগলে মন্দ কি?"

"যত সব বুজরুকি! এই বুড়ো মরলে ওঁর কী গতি করবে তুমি? থানা-পুলিশ পর্যন্ত হতে পারে। আমি বলে রাখছি।"

বুড়ো হেসে বললেন,"দুটো কিষেন দিয়ে উঠোনে গর্ত খুঁড়িয়ে কবর দিস আমায়।"

"আহ্লাদ আর কি! ভূত নিয়ে বাস করব নাকি আমরা?"

"পীর নিয়ে থাকবি। তোর মা ওষুধ দেবে, তোদের আর চিন্তা করতে হবে না।"

"তুমি বিদেয় হওতো। না হয় আমিই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।"

পীরবাবার অপমান হচ্ছিল, দেখে কনক মেয়েকে ধমক দেয়। বলে," তুই থাম পোড়ামুখী, মুখে যা আসে তাই বলে যাবি তুই?"

মনামী গজ গজ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এর একটা বিহিত তাকেই করতে হবে। মনামী অফিস গেল না। ট্রেন ধরে সোজা মেমারি। খোঁজ করে করে পীর মোহাম্মদ রুহুল আমিনের বাড়ি পৌঁছে গেল। গ্রামে অবশ্য তার পীরের খেতাব নেই। রুহুল আমিন নামেই পরিচিত।

দু-দুটো বিয়ে মুরুব্বীবাবার। প্রথমপক্ষ থাকতে থাকতেই দ্বিতীয়পক্ষের পাণি গ্রহণ করেছেন তিনি। থানা পুলিশ কোর্ট আর সালিশির মাধ্যমে দুপক্ষকেই জমি লিখে দিয়ে তবে নিষ্কৃতি মেলে তাঁর। নতুন সংসারও সুখের হয়নি। নিকের দ্বিতীয় বিবির সঙ্গে মনোমালিন্যর পর বুড়ো ঘর ছাড়েন। সব গল্পই শুনল মনামী।

ওদের বাড়িতে জাঁকিয়ে বসে পীরগিরির গল্পকথা সবই শোনায় মনামী তার দুই পরিবারকে। কোনো পক্ষই রুহুল আমিনকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিল না। শুধু পুলিশে জানানোর পরামর্শ দিল তারা।

সারাদিনে একবারও ফোন করেনি মাকে। বিকেলে মা ফোন করে জিজ্ঞেস করল, "অফিস থেকে কখন ফিরবি?"

মনামী উত্তর দেয়,"আমি অফিসে যাইনি আজ।"

"তাহলে কোথায় ছিলি এতক্ষণ! এখনই বা কোথায় আছিস?"

"তোমার গুণধর মুরুব্বীবাবার গুণপনার খোঁজ নিতে তার দেশের বাড়ি এসেছিলাম।"

" সে কি! কী দরকার ছিল? আমায় বলে যেতে পারতিস।"

"তোমাকে বলেও কিছু হয় না মা। তুমি বুড়োভামটার ফ্যান হয়ে পড়েছ।"

"সে আর তোকে জ্বালাবে না। তুই ফিরে আয়।"

"বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে বুঝি! আপদ বিদেয় হল তাহলে?"

"তিনি অনেক দূরে গেছেন। সেখান থেকে আর ফেরা যায় না।"

"তার মানে?"

"তিনি ইন্তেকাল করেছেন।"

"কখন হল?"

"দুপুরে। বুকে ব্যথা বলছিলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ। ডাক্তার ডাকার সুযোগ দেননি।"

মনামী আর একবার মুরুব্বীবাবার দেশের বাড়ি গেল। তাঁর পরিবারবর্গকে খবরটা দিয়েই নিজের বাড়ি ফিরে এলো।

বাড়ি ফিরে মনামী দেখল ওদের বাড়ির সামনে অনেক মানুষের ভিড়। পুলিশও রয়েছে সেখানে। কিন্তু পুলিশ কেন?

আস্তে আস্তে জানল সব। মৃতদেহ সৎকার করতে প্রথমে গ্রামের মুসল্লীরা রাজি হননি। একজন মুসুল্লী সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন লোকটা মুসলমান ছিলেন না। কোনদিন মসজিদে যাননি। একজন তো বলেছেন মুরুব্বীবাবা দোয়া-দরুদ জানতেন না। নিজের মতো করে ঘরে নামাজ পড়তেন। শেষ অব্দি কনকের অনুরোধে কয়েকজন মুসল্লী মরদেহ গোসল দিতে এসে দেখলেন মুরুব্বীবাবার খাতনা করা রয়েছে। নিশ্চিন্ত হয়ে মুসুল্লীরা দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করলেন তখন। সেই সময়ই আবার 'জয় শ্রীরাম' বলা ছেলেরা দাবি করে বসল মরদেহ তারা দাহ করবে। তাতেই বিরোধ দু'পক্ষের। পুলিশ আসা সেই কারণে। শেষে কনক মুরুব্বীবাবার লাশ কবর দেবার পক্ষে মত দিলে বিরোধ থামে।

কাফন পরিয়ে মুরুব্বীবাবার লাশ প্রস্তুত। তখনই মুরুব্বীবাবার পরিবারের লোকজন এসে উপস্থিত। তাঁরা লাশ উঠিয়ে তাঁদের দেশে নিয়ে যেতে চান। এখন আর তা হয় না। কবর খোঁড়া হয়ে গেছে। এখন সেটির কী হবে?

মনামী মায়ের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে বলে বসল, "এখানকার কবরটাতে আমার মাকে জ্যান্ত ভরে দাও তোমরা।"

কনক মেয়ের কথায় আহত হয়। সে ভাবে এই পরিস্থিতির জন্য সে দায়ী কিভাবে! একটা সাহায্যপ্রার্থী মানুষ তার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছিলেন। এতে তার দোষ কোথায়?

তখনই দেখা গেল 'জয় শ্রীরাম' বলা ছেলেরাও দাবি তুলল মুরুব্বীবাবাকে এখানকার গোরস্থানেই গোর দেওয়া হোক। এবার পরিবারের লোকেরাও তা মেনে নিলেন।

ওলাবিবি

শেখ নজরুল ইসলাম

১

আঠারো শতকের শেষের দিক।

বাঁকুড়া জেলার একেবারে পূর্বপ্রান্তে প্রত্যন্ত একটি গ্রাম। নাম ঠাকুরানিদিঘি। ভৌগোলিক মানচিত্র বোধহয় তখনও তার তৈরি হয়নি। আঁতুরঘর দশাও তার ঘুঁচেছে বলে মনে হয় না। সাবেক কালের একটি দিঘি গাঁয়ের নামের পক্ষে প্রমাণ দেয়। তবে দিঘিটি আয়তনে গ্রামটির মতোই খুদে। কয়েকটি মাত্র চালাঘর; সর্বসাকুল্যে তিরিশটি। বাকি অংশ গাছপালা — ঝোপঝাড়ে ভর্তি। দূর থেকে জঙ্গল বলেই মনে হবে।

ঠাকুরানিদিঘি নামের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। পাশেই চারিগ্রাম। এই গ্রামের জমিদার বিজয়নারায়ণ সিংহের মা ছিলেন প্রভাবশালিনী মহিলা। এই মহিলার প্রকৃত নাম তাঁর স্বামী নরনারায়ণ সিংহ ব্যতীত কারও জানা ছিল না।

জমিদারি অহং-চেতনার এও এক নিদর্শন!

জমিদার নরনারায়ণ সিংহের স্ত্রী প্রজাদের কাছে মা ঠাকুরানি নামেই পরিচিত ছিলেন। কথিত আছে, নরনারায়ণ সিংহের বিয়ের রাত্রে অলৌকিক ভাবে তার জমিদারি প্লটের এই অংশে দিঘিটি ফুটে ওঠে। অর্থাৎ কোনও অলৌকিক শক্তি সারারাত খনন কার্য চালিয়ে দিঘিটি তৈরি করে!

এই ঘটনাটিকে নরনারায়ণ সিংহ স্ত্রী-সৌভাগ্য মনে করে অত্যন্ত খুশি হন, এবং তাঁর স্ত্রীর নামেই দিঘিটি লিখে দেন। সেই থেকেই এই অলৌকিক দিঘির নাম ঠাকুরানিদিঘি।

তখন অবশ্য এখানে কোনও বসতির চিহ্ন ছিল না। পরে জনবসতি শুরু হলে এই দিঘির নামেই গ্রামের ঠাকুরানিদিঘি নামটি থেকে যায়।

দিঘিটির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি পিরের মাজার; বলে ‘দক্ষিণদুয়ারীর পির’। বসতি শুরু হবার আগেই একজন চালচুলোহীন ফকির এখানে আস্তানা ফেলেন। কোথা থেকে তিনি এসেছিলেন তা কেউই জানত না; কিন্তু সর্বদা মৌন থাকা এই ফকিরকে হিন্দু-মুসলমান সকলেই বেশ শ্রদ্ধা করত।

শ্রদ্ধার চেয়েও মনে হয় ভয়টা বেশিই। ফকির-সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তিকে ভয় করা মানুষের সহজাত।

এক বৈশাখের বিকালে চারিদিক আঁধার করে মেঘ এগিয়ে আসে। ধীরে ধীরে চারিগ্রামের ঘর-বাড়ি, মাঠ-ঘাট সব কিছু যেন কালো চাদরে ঠাঁই নিতে প্রস্তুত।

ঘোরতর কালবৈশাখি আসন্ন।

এদিকে কাটা সব ধান মাঠে। কালবৈশাখি যে খড়কুটোর মতো সব কিছু উড়িয়ে দেবে তাতে সকলেই নিশ্চিত হয়ে ভয়ার্ত চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। জমিদার নরনারায়ণ সিংহও তাঁর সম্পত্তি নষ্ট হবার আশু সম্ভাবনায় বিচলিত ছিলেন।

কালবৈশাখি ঝড় অবশ্য ওঠেনি!

হালকা বাতাস দিয়েই তখনকার মতো সরে গিয়েছিল। নরনারায়ণ সিংহ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বৈঠকখানায় এসে বসেছেন। একজন নাপিত পায়ের তলায় বসে তাঁর নখ কাটছিল। এমন সময় নায়েব এসে শোনায়, কালবৈশাখির ঝড় এমনি এমনি থামেনি। যেভাবে এসেছিল তা কি এভাবে সহজেই বিলীন হয়ে যায়!

নরনারায়ণ সিংহের বিস্মিত চোখে জিজ্ঞাসা — 'কী বলিস রে!'

নরনারায়ণ সিংহের বিস্মিত চোখের জিজ্ঞাসা প্রশমিত করে নায়েব জানায় — 'হ্যাঁ বাবু, ফকির সাহেবের এটা কেরামতি!'

'কেরামতি? কীসের কেরামতি?' জমিদারের চোখে বিস্ময় তখনও যায়নি।

'যখন চারিদিক ঘন আঁধারে ডুবে এসেছে, এমন সময় ওই ফকির সাহেব চোদ্দ বিঘের মাঠের দক্ষিণ কোণে ধ্যানে বসেছিলেন। দৃঢ়চিত্তে। ধীরে ধীরে তাঁর অলৌকিক শক্তিতে কালবৈশাখি কোথায় মিলিয়ে যায়!'

প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলে নায়েব।

'তা অবশ্যই হবে। নইলে এভাবে অবশ্যম্ভাবী কালবৈশাখি হার মানত না।'

জমিদার নরনারায়ণ সিংহ মনে মনে ভাবে এটা। সেই সঙ্গে আগন্তুক ওই ফকির সাহেবের কেরামতি তাঁকে বেশ আকৃষ্ট করে।

ফকির সাহেবের প্রতি জমিদারের সেই সন্তোষের উপহার ঠাকুরানিদিঘির এই দক্ষিণ-পশ্চিম জায়গাটি। এখানে ফকির সাহেবকে নিশ্চিন্তে থাকার অনুরোধ করেন জমিদার নরনারায়ণ সিংহ।

জমিদার নরনারায়ণ সিংহ মাঝে মাঝে দু-একবার ঘুরতে ঘুরতে ফকির সাহেবের আস্তানায় এসে পড়তেন। কিন্তু ফকির সাহেব মৌনই থাকতেন।

ফকির সাহেবের প্রতি নরনারায়ণ সিংহ আরও বেশি আকৃষ্ট হন এর এক বছর পর।

জমিদারবাবুর কোনও সন্তান ছিল না। বংশের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর মনে একটা চাপা যন্ত্রণা থাকত। অবশ্য তিনি তা কোনওদিন কারও কাছে প্রকাশ করেননি।

একদিন নায়েব নরনারায়ণবাবুকে পরামর্শ দেয়, 'হুজুর, যদি ফকিরবাবার কাছে একবার —'

এতদূর পর্যন্তই বলার সাহস পেয়েছিল বৃদ্ধ নায়েব। জমিদারবাবুর বুঝতে অসুবিধা হয়নি। সেদিনই সন্ধার সময় ফকির বাবার আস্তানায় আসেন তিনি। ফকির সাহেব তখন একমনে পশ্চিমদিকে মুখ করে বসেছিলেন। চোখদুটি তাঁর ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ।

জমিদার নরনারায়ণ সিংহ তাঁর জমিদারি দম্ভ ভুলে ফকির সাহেরের সামনে হাতজোড় করে একেবারে ধুলোতে বসে পড়েন।

'বাবা, নিঃসন্তানের প্রতি সহায় হও।'

ফকির সাহেব কোনও উত্তর করেননি। সেভাবেই বন্ধ চোখে নিঃশব্দ জিকিরে মত্ত ছিলেন। এদিকে নিঃশব্দ হাতজোড় করে বসেছিলেন জমিদারও।

এভাবে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। আস্তানার চারিদিক ক্রমশ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ফকির সাহেবেও যেন কোনও ঘোরে আচ্ছন্ন। রাত্রে আস্তানায় কোনও রকমের আলোর ব্যবস্থা নেই। যাঁরা মারফতি মার্গে বিশ্বাসী তাঁদের অবশ্য আলোর কৃত্রিমতার কোনও প্রয়োজন হয় না।

ফকির সাহেব চোখ মেললেন। অনেক সময় পর। জমিদার নরনারায়ণ সিংহ অবশ্য অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ তাঁর জোড় করা ডান হাতটি কেউ টেনে নেয়। জমিদারবাবু চমকে ওঠেন। আতঙ্কে তাঁর সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বিস্ময় কাটতে না কাটতেই অনুভব করেন, ডান হাতে নরম কিছু কেউ রেখে দিয়ে হাতটা মুঠো করিয়ে দেন। আদেশ করেন — 'ইসকো খিলা দেনা!'

এই রাতের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা নরনারায়ণ সিংহ কাউকে বলেন না। তবে ফকির সাহেবের আদেশ তিনি যথারীতি পালন করেছিলেন এবং তার ফল বর্তমান জমিদার বিজয়নারায়ণ সিংহ।

২

বাংলায় ফকিরদের মধ্যে মাদারি গোষ্ঠীর প্রাধান্য বেশি।

এই মাদারি গোষ্ঠীর ফকির বাংলার নানা স্থানে একসময় অবাধ বিচরণ করেছেন। মূলত এঁরা ছিলেন ভ্রাম্যমাণ সম্প্রদায়। সুদূর পারস্য থেকে ফকিরদের এই মাদারি গোষ্ঠী ছড়িয়ে পড়ে বাংলার এখানে-ওখানে।

পারস্যে এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সৈয়দ বদিউদ্দিন সাহেব। তিনি সুফিদের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়ে হয়েছিলেন সৈয়দ বদিউদ্দিন কুতুব-উল-মাদার। সিরিয়ার হালেব শহরে বসে তিনি সুফি সাধনার চরম লক্ষ্যে পৌঁছান। তবে সমাজ-সংস্কারক হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

সিরিয়ার হালেব শহরের নিরক্ষর মানুষদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য তিনি যথেষ্ট শ্রম করেন।

কথিত আছে, সৈয়দ বদিউদ্দিন সাহেব মক্কায় হজ করতে গেলে তাঁকে আকাশবাণীতে শোনানো হয় —

'বদিউদ্দিন, এখানে নয়, হিন্দুস্থান যাও। সেখানকার মানুষের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করো।'

এই আদেশ বদিউদ্দিন সাহেব শিরোধার্য করে চলে আসেন ভারতে। ভারতে তাঁর অগণিত শিষ্য তৈরি করেন। অচিরেই এই সকল শিষ্যরা মাদারি সিলসিলার সুফি এবং মাদারি পির নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

এই মাদারি সিলসিলারই একজন হলেন মজনু শাহ, যিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ফকির বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন।

মাদারি সিলসিলার বেশ কয়েকজন ফকির উত্তর ভারত থেকে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। এই সময় তাঁরা তাঁদের অলৌকিক শক্তিতে প্রভাবিত করে স্থানীয় মানুষ বা জমিদারদের কাছ থেকে ধর্মীয় অনুদান গ্রহণ করতেন। জমিদাররা দেশে উদার মনেই ফকিরদের এই অনুদান প্রদান করতেন।

কিন্তু ব্রিটিশরা এটা পছন্দ করত না। তাদের কাছে এই ভ্রাম্যমাণ ফকিররা লুঠেরা বলে পরিচিত ছিলেন। তাই কারণে অকারণে ব্রিটিশদের হাতে ফকিররা লাঞ্ছিত হতেন। এমনকি প্রাণও দিতে লাগলেন!

চালচুলোহীন ভ্রাম্যমান সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশাল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালানো সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে তাঁদের নেতা মজনু শাহ মারা যাবার পর এই বিদ্রোহ আরও শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

ফকির বিদ্রোহ নিষ্ঠুর ভাবে দমন হল!

ফকির দেখলেই তাদের মেরে ফেলার আদেশ দিল ব্রিটিশরা। এই সময়ই মাদারি সিলসিলার কয়েকজন বেশরা ফকির আত্মরক্ষার তাগিদে বিভিন্ন গ্রামে আত্মগোপন করেন।

যাঁদের একজন এসেছেন এই ঠাকুরানিদিঘিতে।

৩

দিন এগিয়ে চলে।

ঠাকুরানিদিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নিজের আস্তানায় মাদারি সিলসিলার এই বেশরা ফকির সাহেব একদিন দেহ রাখেন।

খবর পান জমিদার নরনারায়ণ সিংহ। মুসলিম প্রজা দিয়ে ফকির সাহেবের পুণ্য দেহ সেখানে কবরস্থ করান। অত্যন্ত ভক্তি সহকারে। সমস্ত কবর ফুল দিয়ে সাজানো হয় এবং কবরের চারকোণে চারটি সুগন্ধি ধূপ জ্বেলে দেওয়া হয়।

এরপর একজন প্রজাকে কয়েক দিনের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রতিদিন সেখানে ধূপ জ্বেলে দিয়ে যাওয়ার জন্য। কালক্রমে এই রীতি চিরদিনের জন্য প্রচলিত হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে বেশরা ফকির সাহেবের কবর আধ্যাত্মিক জগতের পীঠস্থান করে তোলে এলাকার মানুষ। একদিন ভরত দাস কয়েকটি মাটির তৈরি ঘোড়া কবরের পাশে রেখে দিয়ে যায়; পিরবাবা নাকি তাকে স্বপ্নে এ আদেশ দিয়েছেন!

ক্রমে সেজে ওঠে ফকির সাহেবের কবর।

এভাবে বেশ কয়েকটা বছর অতিবাহিত হয়ে যায়।

একদিন বিকালে নরনারায়ণ সিংহ তাঁর বৈকখানায় বসে ছিলেন। কড়ারডাঙ্গার মনজুর মন্ডল এলো জমিদারের কাছে। খালি পায়ে। জমিদারের সামনে জুতো পরার অধিকার কারও নেই। হাঁটুর উপরে ধুতি বাঁধা তার কোমরে। এসেই সে জমিদারবাবুর পায়ের তলায় ধপ করে বসে পড়ল।

গলার গামছা সামনের দিকে বাড়িয়ে হাতজোড় করে বলল—

'হুজুর, আজ রেতে পিরবাবা সপন দিলেন।'

নরনারায়ণ সিংহ হুঁকা নামিয়ে রেখে বিস্ময়ের স্বর মিশিয়ে শুধালেন -

'কী দেখলি?'

'হুজুর, আমাকে পিরবাবা হুকুম করলে আমি যেন উনার মাজার দেখভাল করি। তাই আপনার কাচে — '

করজোড় আরও সুদৃঢ় করে মনজুর মণ্ডল।

নরনারায়ণ সিংহ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মনজুর মণ্ডলকে আশ্বস্ত করলেন —

'উনি যদি তাঁর কাজে তোকে নির্বাচন করে থাকেন, তাই হবে।'

জমিদারবাবুর আশ্বাসে মনজুর মন্ডলের জীবন-চর্চার চাকা অন্য গতি পেল। সার্থক হল তার কল্প-স্বপ্নের কাহিনি!

কড়ারডাঙ্গার বাপ-দাদার ভিটে ফেলে মনজুর মন্ডল চলে আসে ঠাকুরানিদিঘিতে। জমিদার তাকে জায়গা দেন। মাজার সংলগ্ন কয়েক শতক জায়গা ঘিরে মাজারের সীমা বৃদ্ধি করান। এছাড়াও কয়েক বিঘা জমি লিখে দেন দক্ষিণ-দুয়ারী পির সাহেবের নামে। এই জমি পিরের মাজারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চাষ করবে মনজুর মন্ডল।

বিশ্বস্ততার সঙ্গে মনজুর মন্ডল তার কাজ করে চলল। সন্ধ্যায় মগরিবের পর মাজারে সে সুগন্ধি ধূপ জ্বেলে দেয়। তারপর মাজারেই বসে থাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

দিনমজুর মনজুর এভাবেই একদিন পিরের খাদিম নামে পরিচিতি লোভ করল। আর নামের শেষে 'মন্ডল' পদবি সরিয়ে সেখানে একদিন 'শাহ' জায়গা দখল করল!

মনজুর মণ্ডল হয়ে গেল খাদিম মনজুর শাহ।

৪

দিন অতিক্রান্ত হয়ে চলে। ধীরে ধীরে কয়েক ঘর বসতি গড়ে ওঠে ঠাকুরানিদিঘিতে।

মাগরিবের আজানের পর আনোয়ারা বিবি একটি মাটির পাত্রে পানি নিয়ে মাজারের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। পরনে সায়া ও ব্লাউজহীন মলিন কাপড়।

আঠারো শতকে মেয়েদের এমন পোষাক দুর্লভ নয়। তবে ধনী বাড়ির মেয়েরা সাজগোজ করত, অন্তর্বাস ব্যবহারেও সচেতন ছিল।

কিন্তু ঠাকুরানিদিঘি গাঁয়ের তিরিশটি মুসলিম পরিবারই দরিদ্র; ফলে তারা অন্ত্যজ! মেয়েরা যেমন সায়া ব্লাউজহীন কাপড় পরে, তেমনি পুরুষেরা ধুতি পরে হাঁটুর ওপর তুলে। কেননা জমিদারি রাজত্বে ছোটলোকদের হাঁটুর নীচে ধুতি পরার বিধান নেই!

একমাত্র মনজুর শাহ স্বতন্ত্র। সে লম্বা ধুতির সঙ্গে লম্বা পাঞ্জাবীও পরে। তার তিনটি বিবির পোশাকের মধ্যে আভিজাত্যের ছোঁয়া দুঃস্প্রাপ্য নয়।

আসলে খাদিম মনজুর শাহকে কেউ সাধারণ মানুষের পর্যায়ে এনে বিচার করে না। তিনি হলেন দক্ষিণদুয়ারী পিরবাবার খাস লোক; পির সাহেবের মনোনীত খাদিম।

আজ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে সে এই মাজারের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত। কতো মানুষ এখান থেকে পানিপড়া, ধুলফুল, সিন্নি নিয়ে গিয়ে আরোগ্য লাভ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই তাই খাদিম মনজুর শাহকে অন্য নজরে দেখে। বিপদ কিছু হলেই ছুটে আসে তার কাছে। কাতর ভাবে বলে —

'শাহজী, ছেলেটার প্যাট কামড়াচ্ছে, একটুন ধুলফুল ...'

কেউ বা কাগজে মুড়ে কয়েকটা বাতাসা এনে দেয় শাহজীর হাতে। হলুদ দাঁত বের করে উৎফুল্লে বলে —

'কাল রেতে কাজ হয়েচে গো শাহজী, বউ একদম পানি বরাবর হয়ে গেচে! বেয়ারাপনা একেবারেই নাই। বাবার মাজারে সিন্নি দিতে এলুম।'

এই ভাবে চল্লিশ বছর মনজুর শাহ এই গ্রামে মাজারকেন্দ্রিক আধিপত্য বিস্তার করেছে। জমিদার নরনারায়ণ সিংহের সেই জামানায় পিরসাহেরের খাদিম রূপে নিযুক্ত যখন হয়েছিল, তখন সে যুবক ছিল। এখন সত্তর বছর বয়সে এসে সে রীতি মতো মানুষের চোখে পিরসাহেবের মতোই অলৌকিক শক্তির অধিকারী!

পর্দা নেওয়ার পর একদিন মনজুর শাহর কবরও মাজার হবে - এটা মনজুর শাহ'র বাসনা। তার এই বাসনার কথা পরিবার এবং গ্রামের অনুগামী কয়েকজনকে বলেও রেখেছে সে। তার কবরকে কেন্দ্র করে এখানে সৃষ্টি হবে নতুন এক পিরবাবার অধ্যায়। লোকে বলবে, 'চল মনজুর শাহ পিরের

মাজারে মাথা ঠুকে আসি, বাঁজা বউটা যেদি ছেলের মুক দেকে!'

জমিদার নরনারায়ণ সিংহ তাঁর নিজের গ্রামে কোনও মুসলমানকে বসতি করতে দেননি। অন্যান্য দূর গ্রাম থেকে যে সব মুসলমান পরিবার উঠে এসেছে, তাদের ঠাকুরানিদিঘিতে বসতি করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে যে কয়টি ঘর এই গ্রামে আছে, সবই মুসলমান।

যাকে বলে প্রান্তিক মুসলমান।

প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর মনজুর শাহ মাজার থেকে বেরিয়ে আসে। আনোয়ারা বিবিকে দেখে জিজ্ঞাসা করে —

'কি গো নূর আলির বউ, কী হলো আবার?'

'কোলের মেয়েটার জ্বর নামচে না। গা পুড়ে যাচ্চে। একটুন পানিপরা দাও না।'

মনজুর শাহ পানির পাত্রটি নেয় আনোয়ারা বিবির হাত থেকে। বিড়বিড় করে কিছু বলে ফুঁ দেয় তাতে। এই ভাবে তিনবার ফুঁ দিয়ে সেটি পুনরায় আনোয়ারা বিবির হাতে দেয়।

'রেতেই তিনবার খাইয়ে দিও।'

আনোয়ারা বিবি কৃতার্থ হয়ে পিছন দিয়ে হেঁটে হেঁটে রাস্তায় ওঠে। মাজারকে পিছনে রেখে যেতে নেই যে!

মনজুর শাহ মাজারের উত্তর দিকে হেলে পড়া খেজুর গাছটির দিকে দেখে। কয়েকদিন থেকেই সে বড়খোকা দিলদারকে বলছে গাছটি কেটে ফেলতে। শেষে কারও মাথাতে পড়ে বিপদ না ঘটে!

ভয়ে ও শ্রদ্ধায় গাঁয়ের অন্য কেউ মাজারের এ গাছ ছোঁবে না।

হেলে পড়ার জন্য রাস্তায় চলতে অসুবিধা হলেও কেউ কিছু করবে না। পিরের গাছ, হাত দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। কেউ যদি এই মুর্খামি করে তার চরম ক্ষতি করবেন পিরবাবা।

এই তো সেদিন মনোয়ারের দশ-বারো বছরের ছেলেটা পিরতলা থেকে একটি পড়ে থাকা শুকনো নিম ডাল তুলে নিয়ে গিয়েছিল ঘরে। অবুঝ ছেলে জানে না, মা তাকে জ্বালুন করতে পাঠালে সে রাস্তার ওপর পড়ে থাকা সেটি তুলে নিয়ে মাকে দেয়। পরদিন সকালে তো তার অবস্থা কাহিল।

ঘাড়টা তার বাঁদিকে ঘুরে যায়!

কোনও ভাবেই তা সোজা হয় না। অনেক ধমকাধমকির পর তার এই অপকর্মের কথা সে স্বীকার করে।

পিরবাবাই যে রাগে ছেলেটির ঘাড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাতে কারও সন্দেহ থাকে না। শেষে ছেলেটির মা দিঘিতে ডুবে ভিজে কাপড়ে ছেলেকে নিয়ে মাজারে গিয়ে ধুলোতে উপুড় হয়ে পড়ে পিরবাবার কাছে ক্ষমা চাইলে সে যাত্রায় উদ্ধার পায়।

আঁধার হয়ে এসেছে দেখে মনজুর শাহ জিকিরের জন্য মাজারে ঢুকতে যাবে এমন সময় রাস্তা থেকে ডাক শুনতে পেল।

'শাহজী!'

কাছে এসে দেখল দশরথবাটির সনাতন। সঙ্গে তার দুই ভাই। সনাতনের হাতে একটি বড়ো লাল মোরগ, অপর একজন ভাইয়ের হাতে বেতের ডালাতে বেশ কিছু চাল ও আলু।

সনাতন জ্যান্ত মোরগটা এক ভাইয়ের হাতে দিয়ে রাস্তাতেই উপুড় হয়ে শুয়ে মাজাদের উদ্দেশে জোড়হাত করে উঠে দাঁড়াল। প্রফুল্ল মুখে খাদিমের দিকে তাকিয়ে বলল —

'ছেলেটা সেরে উঠেচে শাহজী, বাবার করুণায় এ যাত্রায় ছেলেটা আমার রক্ষে পেল। আমার বউ মানত করেছিল ছেলেটা সেরে উঠলে বাবার মাজারে এগুলো দিবে।'

দিন দশ আগে সনাতন হন্তদন্ত হয়ে মাজারে আসে। হঠাৎ তার ছেলেটি কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে! মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে শেষ চেষ্টায় সে আসে পিরবাবার কাছে। মনজুর শাহ তাকে পাতাতে মুড়ে কিছুটা ধুলফুল ও পানিপড়া দেয়। তা খেয়েই ছেলেটি বেশ সুস্থ হয়ে ওঠে। কলেরার মতো মারণরোগ থেকে পিরবাবা তার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, তারই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই সামান্য কিছু।

মনজুর শাহ সনাতনের মানত দেওয়া সামগ্রী নিয়ে মাজারের ভিতরে রেখে দেয়। পরে ওরা চলে গেলে নাতিদের ডেকে সেগুলি ঘরে পাঠিয়ে দেয়।

৫

কলেরার প্রকোপ চারিদিকে ভয়াবহ আকার নেয়।

রসুলপুর, জিনকরা, বাতানিয়া, কোতুলপুর, ইন্দ্রহাস প্রভৃতি গাঁয়ের অনেক মানুষ এই রোগের শিকার। কয়েকজন মারাও গেছে ইতোমধ্যে।

আঠারো শতকে এই ওলাওঠার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা মানুষের ছিল না। চোখের সামনে বাবা, মা, ছেলে, বউ, মেয়ে শেষ হয়ে যেত। যার ভাগ্য ভালো শুধুমাত্র সে-ই ক্ষীণ শরীরে বেঁচে উঠত।

গতকাল কোতুলপুরের সুবল সাহার পরিবারের চারজন মারা গেছে। কলেরা এখন মানুষের কাছে আতঙ্কের আর এক নাম। ভয়ে কলেরা উচ্চারণ করতে সাহস পায় না কেউ; যদি তাকে ধরে!

কিছু কিছু গ্রামে আবার এর কোনও প্রভাবই নেই।

দিব্যি সেখানকার মানুষরা সুস্থ আছে। তবে আতঙ্ক তাদের মনেও প্রবেশ করেছে। এই সব প্রত্যন্ত গাঁয়ে কোনও ডাক্তারের চিকিৎসা পৌঁছায় না।

অবশ্য এই রোগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চিকিৎসায় মানুষের যত না বিশ্বাস তার চেয়ে বেশি বিশ্বাস কুসংস্কারে। আর এই কুসংস্কারের ওপর ভর করেই এই রোগের নির্দিষ্ট দেবীও জন্ম নিয়েছে এই সময়েই।

ওলাইচন্ডী!

ঠাকুরানিদিঘি থেকে কোতুলপুর খুব বেশি দূর হবে না। তবুও হাঁটা পথ প্রায় দু'ঘণ্টা। একদিন রাতে মনজুর শাহ বেরিয়ে পড়ল। হাতে লাঠি। লাঠির ডগাতে ধাঁধা পুঁটলিতে গামছা। এই গামছাটাই আজ তার মনোবাসনা পূরণ করবে। জন্ম দেবে নতুন এক ইতিহাসের।

কোতুলপুর পৌঁছাতে রাত গভীর হয়ে যায়। অল্প জোছনায় গ্রামটিকে দেখা যায়। যেন নিথর হয়ে প্রহর গুনছে।

এই রাতেই হয়ত আরও কয়েকটা লাশ ঘর থেকে পাওয়া যাবে!

কলেরার প্রকোপ কোতুলপুরে যে প্রবল।

মনজুর শাহ এগিয়ে গেল গাঁয়ের পশ্চিম দিকে। হ্যাঁ, এই সেই পুকুর। গাঁয়ের লোক এর পানিই ব্যবহার করে।

চারিদিক প্যাচপেচে কাদা, এখানে ওখানে নোংরা; দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে চারদিকে।

এদিক ওদিক একবার তাকাল মনজুর শাহ। রোগগ্রস্ত গাঁয়ে এই নিশুতি রাতে কেউ বাইরে আসবে না। ওলাওঠার কবলে পড়া লোকের পরিজন তাদের সেবায় বা দুশ্চিন্তায় ঘরেই মনমরা হয়ে রয়েছে।

এই বয়সেও মনজুর শাহর ক্ষিপ্ততা প্রবল। এতোটা মেঠো পথ হেঁটে এসেও সে ক্লান্ত নয়। তাড়াতাড়ি সে পুঁটলির গামছাটা বের করে। তারপর নিচু হয়ে সেই বিষাক্ত পুকুরে তার গামছাটা ভালো করে ডুবিয়ে তুলে নেয়।

মনজুর শাহ এবার নিজের গাঁয়ে এসে দাঁড়ায় বড়পুকুরের পাড়ে। রাত প্রায় শেষ প্রহর। বড়পুকুরের পানি সমগ্র গ্রাম তাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনে লাগায়। শুধুমাত্র মনজুর শাহর নিজের পরিবার মাজারের দিঘির পানি ব্যবহার করে।

ওই পানিতে কারও অধিকার নেই!

মনজুর শাহ পাড় থেকে পুকুরে নামে। পুঁটলি থেকে ভিজে গামছা বের করে বড় পুকুরের স্বচ্ছ পানিতে তা নিঙড়ে দেয়।

এবার মনজুর শাহ জান ভরে শ্বাস নেয়।

এতো বড়ো অভিযান সে প্রায় দমবদ্ধ করে চালিয়েছে। একা। এবার সে সফল। সব থেকে বড়ো তৃপ্তির ব্যাপার হল, এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অভিযানে কেউ সাক্ষী রইল না।

'ওলাবিবি, তুমাকে আমি ঠাকুরানিদিঘিতে জনম দিলুম। ঠিক যেমন করে বৈকুণ্ঠপুরে বিশে বামুন ওলাইচন্ডীকে...'

ঠাকুরানিদিঘি উজাড় হয়েছে!

ওলাবিবির মাজারে মাথা ঠুকেও কেউ নিস্তার পায়নি। মনজুর শাহ ও তার পরিবারও।

কলেরার প্রকোপে সমস্ত গাঁ উজাড় হয়েছে এই সত্য সবাই জানে; কিন্তু এর পিছনের প্রকৃত ইতিহাস কেউ জানতে পারল না!

মুক্তগদ্য

দণ্ড কক্ষ

আব্দুল বারী

ভাদ্র মাস। যেমন গুমোট তেমনি রোদের তেজ। স্কুলগেটে গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করেন রতন বাবু। সবুজ ঘাস যেন বাগদাদী গালিচা। মাঠ পেরিয়ে স্কুল বারান্দায় পা দিতেই দুই পিরিয়ডের শেষ ঘন্টা বাজল।

সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরের উঠে প্রধান শিক্ষকের ঘরে ঢোকার আগে চোখ দুটো আটকে গেল বারান্দার শেষে একটা দরজার উপর। প্রধান শিক্ষকের ঘর পেরিয়ে একটা ঘরের পরেই বারান্দার সোজাসুজি একটা দরজা। উপরে লেখা দণ্ডকক্ষ।

ভাদরের খররোদের আগুন জ্বলে ওঠে মাথায়। প্রধান শিক্ষকের ঘরে প্রবেশ করে দেখেন ঘর ফাঁকা। একপাশে একটা মাঝবয়েসী লোক বসে আছেন। আগন্তুক এর উপর চোখ পড়তেই তিনি উঠে দাঁড়ান। তারপর বলেন, আসুন স্যার, আসুন। আগন্তুক এগিয়ে গিয়ে মাথায় উপর একটা ফ্যান দেখে নিয়ে চেয়ারে বসলেন। তারপর বলেন, হেডমাস্টার কোথায়? কথা শেষ হওয়ার আগে ঘরে ঢোকেন মইদুল ইসলাম। হাতে তখনও চকের গুঁড়ো লেগে আছে। সেগুলো ঝাড় ছিলেন।

স্কুল কেমন চলছে ?

ভালো স্যার।

কিছু খুচরো কথা বলার পরে বলেন, আচ্ছা মিড ডে মিলের খাতাগুলো একটু বের করুন। সেইসঙ্গে আজকের স্টুডেন্ট অ্যাটেনডেন্স।

মইদুল সাহেব মিড ডে মিলের খাতা এগিয়ে দিয়ে কোণে বসা ভদ্রলোককে বলেন, সুরোজকে একবার ডাকুন তো। রোল কলের খাতাগুলো স্টাফ রুম থেকে আনতে হবে।

ভদ্রলোক কক্ষ থেকে বেরিয়ে নিচে যান। আগন্তুক খাতার উপর চোখ রেখে একটু ঝাঁজালো সুরে বলেন, ওপাশের ওই কক্ষটির নাম কি যেন?

কোনটা স্যার?

আরে ওই যে, বারান্দার শেষের ঘরটি।

ও, ওটার নাম দণ্ডকক্ষ।

তারমানে? আপনি কি জানেন না এখন স্কুলে ছাত্র ছাত্রীর শাস্তি দেওয়া নিষেধ। R.T.E.A ২০১০ এর নির্দেশ আপনার জানা নেই? মধ্যযুগীয় ভাবনা বন্ধ করুন। ভাদরের তপ্ত বাতাসের একটা হল্কা বয়ে গেল ঘরের মধ্যে।

মইদুল সাহেব কিছু না বলে মিড ডে মিলের স্টক রেজিস্টার খাতা বের করে পাতা উল্টাতে থাকেন।

আগন্তুক একরাশ বিরক্তির সঙ্গে বলেন, আজকের রান্নার মেনু কি বলুন তো?

একটা খাতা এগিয়ে দেন মইদুল সাহেব। খাতার পাতায় প্রতিদিনের তারিখ আর রান্নার সবজি ডাল তরকারির চার্ট করা। সরকারি মেনু চার্ট কে সামনে রেখে তৈরি করা।

হুঁ, তা খাতাতো অনেকগুলো তৈরি রেখেছেন দেখছি। রাঁধুনি মেয়েরা পোশাক পরে তো?

পরে। তবে আপনি একবার স্বচক্ষে দেখলে ভালো হয়।

যাবো, যাবো। সব দেখব। তা ওই কক্ষটির কথা তো কিছু বললেন না। কি ব্যাপার;এখনো ছেলেমেয়েদের জমিদারি নির্যাতন চালাচ্ছেন নাকি। ব্যাপারটা কিন্তু ভালো না। আপনার স্কুলের রিপোর্ট কিন্তু আমাদের কাছে আছে। বছর চারেক আগে ছাত্র আন্দোলনে এস,আই, বিডিও, ওসি সবাইকে ছুটে আসতে হয়েছিল।

আমরা তিন বছর এগিয়ে এসেছি স্যার। আর তাছাড়া আমার এই স্কুলে আসা মাত্র আড়াই বছর হলো। ফলে পূর্বের কথা আমি জানি না।

তা জানতে না পারেন। কিন্তু বিল্ডিং তো নতুন করে রং করা হয়েছে। আর দেওয়ালের লেখাটা তো নতুন। এটাও আপনি জানেন না বুঝি? কোন দিন আপনার চোখে পড়েনি বুঝি?

পড়েছে। ওটা আমি লিখিয়েছি। শুধু লিখাইনি রীতিমতো ব্যবহারও করছি।

কি বলছেন ভেবে বলছেন তো? নাকি আমাকে চিনতে পারেননি?

ভেবে বলছি স্যার। আর আপনাকে আমি চিনি। আপনি আমাদের সার্কেলের এ, আই।

এ,আই রতন পান্ডের চোখে চোখ রেখে স্পষ্ট উচ্চারণে কথাগুলো বলেন মইদুল সাহেব।

কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে অবাক হোন রতন বাবু। একজন দক্ষ প্রশাসক হিসাবে সুখ্যাতি আছে তার। কোন স্কুলে পা রাখলে হেডমাস্টারমশাই খেই হারিয়ে ফেলেন। আর আজকে কিনা একটা হাঁটুর বয়সি ছেলে তার চোখে চোখ রেখে এমন কথা বলছে। কত বয়স হবে চল্লিশ বা বিয়াল্লিশ। তার ছাপ্পান্ন বছরের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে এমন স্পষ্টভাষী মানুষ খুব কমই আছে। অনেকক্ষণ থম মেরে বসে থাকেন রতন বাবু। মাথার উপর সশব্দে ফ্যান ঘুরতে থাকে। তারপর আরও বেশকিছু খাতাপত্র, কাগজপত্র দেখতে থাকেন। বুকের ভেতরটা কেমন জ্বালা জ্বালা করছে। অ্যাসিড হয়েছে বোধহয়। আজকাল অজীর্ণে ভুগছেন খুব।

খাতা পত্র দেখা শেষ করে বোতল থেকে একটু জল খেয়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, চলুন স্কুলটা একটু ঘুরে দেখি। বাইরে লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে শুরু করেন। থামে থামে বিভিন্ন সাল তারিখ লেখা। ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মদিন, ২৩ জুন ১৭৫৭ পলাশীর যুদ্ধ। এমনি সব থামে থামে বিশিষ্ট ব্যক্তি, উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সাল-তারিখ লেখা। প্রতিটি ঘরের দরজার উপর বিভিন্ন মনীষীদের নাম, দেওয়ালের একপাশে তাদের ছবি। সংক্ষেপে তাদের জীবনী লেখা। হঠাৎ একটি ঘরের সামনে রতন বাবু থমকে দাঁড়িয়ে যান। দরজার উপর লেখা ‘একখণ্ড মুর্শিদাবাদ’। ব্যাপারটা বুঝতে পারেন না। পিছন থেকে মইদুল সাহেব বলেন, চলুন স্যার ভিতরে।

ভিতরে ঢুকে একেবারে থ হয়ে যান রতন বাবু। চার দিকের দেয়ালে ফ্লেক্সে নানা ছবি আর তার নিচে ইতিহাস লেখা। জাহানকোষা কামান, ইমামবাড়া, হাজারদুয়ারি, কাটরা মসজিদ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র, কে.এন কলেজ এমনসব নানা ছবি। সংক্ষেপে তার পরিচয়। কতগুলো ছবি দেখে তিনি নিজেই অবাক হয়ে যান। বিস্ময়ের আবেশ চোখে মুখে মেখে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ান। নিচে সবুজ মাঠ। বারান্দার নিচে খেলার মাঠের গা করে দশ ফুট করে জায়গা জুড়ে বিভিন্ন ফুলের গাছ লাগানো। মাঠের দিকে নেটের বেড়া দেওয়া। সুন্দর করে জ্যামিতিক আকারে ফাঁক ফাঁক করে বিভিন্ন ফুলের গাছ লাগানো। কতক গুলোতে ফুল ফুটে আছে। পাশে দুই হাত লম্বা কঞ্চি পোঁতা। তাতে একটা পিচবোর্ডের গায় সুন্দর করে গাছের নাম লিখ বেঁধে রাখা হয়েছে। প্রতিটি গাছের এইভাবে পরিচয় দেওয়া।

কেমন যেন ঘোর লেগে যায় রতন বাবুর। নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না। এই স্কুল সম্বন্ধে অফিসে বসে কত কথা শুনেছেন। টিউবয়েলের মাথা ভেঙে দেওয়া, দরজা ভেঙে ফ্যান চুরি করা, ক্লাসরুমে ক্যারিব্যিগে করে পায়খানা ছড়িয়ে রাখা। না মিলছে না তো কিছুই। মইদুল সাহেব বলেন আসুন স্যার মিড ডে মিলের ডাইনিংটা একবার দেখবেন।

মাইদুল সাহেব আমাকে আর ডাইনিং রুমে নয় একবার দণ্ডকক্ষে নিয়ে চলুন।

কেন স্যার?

ওখানে যাওয়াটা খুব জরুরী।

হাঁ যাব। তবে ওখানে যাওয়ার আগে আরেকটি ঘরে আপনাকে নিয়ে যাব। সামনে এগিয়ে গিয়ে ওই যে ওই ঘরটায়।

সুরোজ এসে ঘরের তালা খুলে দেয়। দরজার উপর লেখা ‘প্রতিভার খোঁজে’। ঘরে ঢুকে রতন পান্ডের বিস্ময়ের সীমা ছাড়ায়। দেওয়ালে দেওয়ালে ছাত্রছাত্রীদের হাতে আঁকা ছবি, নিচে নাম ক্লাস রোল লেখা। চারিদিকে দেওয়ালের কাছ দিয়ে বেঞ্চ পাতা। তার উপর বিভিন্ন ধরনের মডেল। বিজ্ঞানের, ভূগোলের, এমনি সাধারণ কোন জিনিসের। মইদুল সাহেব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে বলেন, শহরের ছেলেদের মত ভাল মানের মেটেরিয়ালস দিয়ে এসব তৈরী নয়। হাতের কাছে যা আছে তাই দিয়ে বানিয়েছে ছেলে মেয়েরা। সারা মাস ধরে ছেলেমেয়েরা এসব তৈরি করে আর শিক্ষকদের কাছে জমা দেয়। শিক্ষক মহাশয়গণ এর মধ্য থেকে যেগুলো

ভালো লাগে বেছে নেন। আর এঘরে স্থান দেন। কিছু পুরস্কারও দেওয়া হয়। ছেলেমেয়েরা একমাস অপেক্ষায় থাকে এই ঘর খোলার দিনের। নিজের জিনিসটা এঘরে আছে কিনা দেখার জন্য। প্রতি মাসে বেশ অনেক করেই জিনিসপত্র জমা হয়। তবে এই ঘরে স্থান পাওয়ার অন্যতম শর্ত হলো নিয়মিত স্কুল আসা। ভালো জিনিস তৈরি করলেই হবে না স্কুলের উপস্থিতিও বিচার করে এই ঘরে তাদের স্থান দেওয়া হয়। এক এক ক্লাসের ছেলেমেয়েরা সারবেঁধে এই ঘরে ঢুকে দেখে যায়। নিজের মডেল স্থান না পেলে নিজেকে সামনের মাসের জন্য তৈরির কাজে লেগে যায়।

আচ্ছা মইদুল সাহেব, জেলায় যে বিজ্ঞান মেলা হয় সেখানে আপনার স্কুলের ছেলেমেয়েরা যায় না।

যায় স্যার। এবার তৃতীয় স্থান পেয়েছিল একটি ছেলে। তবে জেলার বিচারকদের মডেল বেছে নেওয়ার ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

ও আমি বুঝতে পেরেছি। আর এটাই তো আমাদের দেশের এগিয়ে যাওয়ার পথে অন্যতম বাধা। এত বড় দেশ অথচ বিজ্ঞান গবেষণায়, খেলাধুলায় সর্বত্রই কেমন পিছনের দিকে। অলিম্পিকে সোনার ঝুলির দিকে তাকালে বড় দুঃখ হয়। ছোট ছোট দেশ আমাদের থেকে বেশি সোনার মেডেল পায়।

বড় খাঁটি কথা স্যার। এ লজ্জা আর কতকাল আমাদের বইতে হবে কে জানে।

টিফিন আওয়ার চলছে। বাইরে সবুজ মাঠে কৈশোরের ঢেউ বইছে। কলকাকলিতে মুখরিত চারপাশ। সুরে আর ছন্দে বাজছে স্কুল। মিড ডে মিলের ডাইনিংয়ে যাওয়ার আর প্রবৃত্তি হলো না রতন বাবুর। গত কয়েকদিন আগে একটি স্কুলে গিয়েছিলেন। আধা-শহরে অবস্থিত স্কুলটি। সেখানকার ছেলে মেয়েদের চলাফেরা, কথাবার্তা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। দুটো ছেলে তো বারান্দা দিয়ে যাওয়ার সময় তার গায়ের উপরে পড়ে আর কি। কানের পাশ দিয়ে পেছনদিকে চুল ছোট করে ছাটা, মাথার উপর কাকের বাসার মতো লম্বা লম্বা চুল। লালচে রং করা। হাতে বালা, গলায় মোটা মালা। উপরের জামাটা স্কুল ইউনিফর্ম হলেও নিচের প্যান্ট জিন্সের। কেমন উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। স্টাফ রুমের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চমকে ওঠেন রতন বাবু। স্টাফ রুম থেকে শিক্ষকদের জোরালো তর্কবিতর্কের আওয়াজ কানে আসছে। তাতে শব্দের শালীনতার মাত্রা বজায় নেই। অথচ কো-এড স্কুল। আর আজ এই স্কুল দেখছেন।

মইদুল সাহেব কে সঙ্গে নিয়ে দপ্তরকক্ষে প্রবেশ করেন রতন বাবু। তিনটে ছাত্র-ছাত্রী আর একজন শিক্ষক ঘরে বসে আছেন। একজন ছাত্র খাতায় অংক কষে চলেছে, আর এক জন বই থেকে কিছু একটা কপি করে চলেছে, কার্পেটের উপর বসে একটা মেয়ে একমনে ছবি আঁকছে। মইদুল সাহেব আর রতন বাবুকে দেখে তারা উঠে দাঁড়ায়। মইদুল সাহেব হাতের ইশারায় বসতে বলেন। ছেলেমেয়েরা বসে পড়ে যে যার কাজ আবার শুরু করে। মইদুল সাহেব শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে বলেন, রহিম সাহেব আপনি গিয়ে একটু টিফিন করে নিন।

রতন বাবু বলেন, কি ব্যাপার টিফিন আওয়ারে এরা এখানে কেন?

এটাই তো ওদের শাস্তি।

তার মানে?

এ প্রায় দিন ক্লাসে ফাঁকি দেয়। বাড়ি থেকে ঠিকমত অংক করে আনে না। আজও করে আনেনি। তার উপর ক্লাসে মাস্টারমশাই যখন অংক বোঝাচ্ছিলেন তখন ও গল্প করছিল। তাই আজ ওকে দশটা অংক পাঁচবার করে করতে হবে। টিফিনে বাইরে খেলতে পাবে না।

ঘন্টা পড়লে ক্লাসে যাবে।

বুঝতে পেরেছি মইদুল সাহেব, আর বলতে হবে না। মইদুল সাহেবের মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর নিচে বসা মেয়েটার ছবি আঁকা দেখতে থাকেন। দেখতে থাকেন সেই মুখের দর্পণে কোন দুঃখের ছায়াপাত ঘটেছে কিনা। কিন্তু সেখানে এক অনাবিল খুশির লুকোচুরি ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ে না।

আজ অফিস থেকে বেরোবার সময় মনে মনে ভেবে ছিলেন গত দুই দিনের মতো আজও মিড-ডে-মিল, বুকগ্রান্ড প্রভৃতি বিষয়ে খাতায় অসঙ্গতি পেলে বেশ করে হেডমাস্টার মশাইকে দাবড়ে যাবেন। শোকজের চিঠির অপেক্ষায় থাকতে বলবেন। হেডমাস্টার, টি.আর,করণিকদের করুন মুখ আর মিনতি ভরা চোখ দেখবেন। তার পরিবর্তে একি দেখছেন, এ যে পবিত্র ভূমি, সত্যিকারের বিদ্যানিকেতন।

কুমারের কথা ভেসে যায় তিস্তার স্রোতে

মহম্মদ বাকীবিল্লাহ মণ্ডল

গাড়ি থামলো কালিঝরায়। এক-একটা ঝরনা বা জল প্রপাত যেন এক একজন নিত্যবেশী পাহাড়ি কন্যা। সর্বক্ষণ নেচে নেচে তারা যেন পাহাড়ে আগত-অতিথিদের স্বাগত জানাচ্ছে। আবারও বলছি পাহাড়ী রাস্তার খাঁজে খাঁজে যদি আমার বাড়ি হত। তাহলে কতই না ভালো হত। চরকির মতো ঘুরপাক খেতে খেতে আমাদের গাড়ি ছুটছে। আমাদের এক বন্ধু মহম্মদ রফির গান শোনাচ্ছে। মাঝে মাঝে ড্রাইভার এবং আমাদের মধ্যে নানান কথাবার্তা এবং হাসি-ঠাট্টায় ক্লান্তি দূর হচ্ছে। আমার মন যেন ডুবুরির ন্যায় খুঁজে বেড়াচ্ছে পাহাড়ের আলো ছায়া রুপের ঝলকি ঝলকি সুন্দর। সবুজের আবীরে প্রলেপ দেওয়া নৈসর্গিক মেদুরতা। পাহাড়ে ধাপে ধাপে পাহাড়ি মানুষের বসত বাড়িগুলো যেন পাহাড়ের সাতনরী হার।

উপরে নীল আকাশ, নীচে সবুজ গালিচা। গাড়ি ক্রমশ উপরের দিকে উঠছে। ক্রমশই আমরা ভয়ঙ্কর সুন্দরের দিকে এগুচ্ছি। ভয়ে বুক দুরুদুরু করছে। পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে দোওয়া মাগছি। মনে হচ্ছে হার্ট ব্লক হয়ে যাবে। কিছু একটা ঘটে গেলে কি হবে? এখানে তো কাছাকাছি হাসপাতাল নেই। মানস পর্দায় ভেসে উঠলো ছেলে-মেয়ের মুখ। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম জীবনে আর পাহাড়ে আসবো না। রোদ-আলোর লুকোচুরি চলছে ক্রমাগত। কখনও বা ঘন কুয়াশার আস্তরণে ঢেকে যাচ্ছে পাহাড়। পাহাড়ী উপত্যকাগুলি যেন সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে রেখেছে নিপুণ যত্নে। যত উপরে উঠছি ততই বাতাসের জোরালো প্রবাহ। অক্টোবরের শেষ সপ্তায় ঠাণ্ডা বেশ কামড় দিচ্ছে। গাড়ির গতির সঙ্গে সঙ্গে সূর্যও ছুটছে পশ্চিমের আকাশে। এক সময় পৌঁছে গেলাম জুলুক।

জুলুকের সেনা শিবিরগুলোতে সৈন্যদের ব্যস্ততা চোখে পড়লো। সেখানকার 'view point' থেকে ৫৫ বাঁকের রাস্তা বা জিকজাক রোড় যেন পাহাড় রাণীর গলার মালা। এই রাস্তা পাকদণ্ডী বা ভুল-ভুলাইয়া নামেও পরিচিত। সেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে যেন নাগালের মধ্যেই মনে হয়। অথচ কত দূর এবং কী সুন্দর। ...

ড্রাইভারের ব্যস্ততা ছিল। আমাদেরকে গ্যাংটকে পৌঁছে দিয়ে আবার সে লিংতামে ফিরবে। তাই একেক জায়গায় সে বেশি সময় খরচ করতে চায় না। অতএব তার তাড়ায় আবার গাড়িতে উঠলাম। এবার পৌঁছলাম থাম্ভি 'view point' এই জায়গাটি আরও উঁচু। ভয়ে শরীর ও মন কাঁটা হয়ে যাচ্ছে। এক একটা পাহাড়ের সারি আর উপত্যকাকে মনে হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী-নারী। কাশ্মীরের সৌন্দর্যের সঙ্গে এখানকার সৌন্দর্যের পার্থক্য আছে। তা হল কাশ্মীরের সৌন্দর্যে যেন কোন অদৃশ্য হাতের কেরামতি আছে। বিধাতা যেন নিজ হাতে কাশ্মীরী বাগান সাজিয়েছেন। কিন্তু এখানকার সৌন্দর্য কিছুটা অগোছালো, প্রকৃতির আপন খেয়ালেই এই পাহাড় রাণী তার রুপের ডালি সাজিয়েছে।

থাম্ভিতে পাহাড়ের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এখানকার গাছগুলো ন্যাড়া। তাছাড়া পাহাড়ের বনগাছগুলো সবুজ নয়; লালচে, পিঙ্গল ও ফ্যাঁকাশে - ফ্যাঁকাশে। বছরের প্রায় ৪-৫ মাস বরফে জমে থাকে, তাই বড় গাছ জন্মায় না। ঘাস এবং গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ গজায়।

সামনে নাথান ভ্যালি। গাড়ি একটু একটু করে নীচে নামছে। মনে ও ধড়ে একটু একটু করে স্বস্তি ফিরছে। নভেম্বরের ১৫ তারিখের পর এখানে প্রচুর বরফ পড়ে। সেই সময় উপভোগ করার মতো দৃশ্য তৈরী হয় এখানে। প্রচুর পর্যটক আসেন।

মধ্যাহ্ন সময় পেরিয়ে গেছে। রাস্তা ক্রমশ নীচের দিকে নামছে। রাস্তাও অনেক ভাল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। রাস্তায়

পর্যটকের ভিড়। গাড়ির মধ্যে দোল খেতে খেতে আমরা বেশ ক্লান্তও ক্ষুধায় কাতর। পৌঁছে গেলাম লুংথাংয়ে। সেখানে সেনানিবাস আছে। রাস্তার প্রধান প্রধান স্থানে সেনাদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা গেল। তারপর পৌঁছে গেলাম পুরনো বাবা মন্দিরে। পুরনো বাবা মন্দিরে আসার পথে একটা ছোট্ট বাজার। কুলুপ বাজার। আমি নামতে চাইলেও দলনেতা প্রধান শিক্ষকের নিরুৎসাহে আর নামা গেল না। সেখানে একটা 'lake' আছে। একটা ছোট পচা পুকুরের মতো। তাই দেখতে মানুষ জন আসেন। আসলে শীতকালে এখানেই রবফ জমে যায়। তাই ভাল দেখায়। অন্য সময় পচা পুকুরই মনে হয়। পুরনো বাবা মন্দিরের সামনে গাড়ি কিছুক্ষণ থেমেছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে কেউ আর মন্দিরে প্রবেশ করলো না। মন্দিরের সামনে থেকে কিছু ছবি তুললাম। প্রাকৃতিক কাজ সেরে আবার গাড়িতে উঠলাম। যাওয়ার পথেই পড়লো 'elephanta lake'। এই লেকের এক প্রান্ত হাতির মস্তকের মতো আকৃতি বিশিষ্ট তাই এই রুপ নাম। এটাও ফ্লাট এবং অগভীর। জল বেশি নেই। যেটুকু আছে তা নোংরা। এখানে আর নামলাম না। গাড়িতে বসেই দেখলাম। তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম নতুন বাবা মন্দিরে।

জনশ্রুতিতে জানা যায় যে, 'পাঞ্জাব রেজিমেন্টের' বীর সেনানী হরভজন সিং ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে এক দুর্ঘটনায় পুরানো বাবা মন্দির এলাকাতেই মারা যান। ফৌজিরা তার স্মৃতিতেই একটি মন্দির গড়ে তোলেন। মন্দিরে হরভজন সিংহের ব্যবহৃত পোশাক-আশাক, তাঁর ছবি প্রভৃতি খুব সুন্দরভাবে সাজানো আছে। এই অঞ্চলের ফৌজিরা মনে করে যে, এই দুর্গম অঞ্চলের যেকোন ধরণের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার হাত থেকে বাবা হরভজন সিং তাদের রক্ষা করেন এবং অশরীরী আত্মা হয়ে তাদের পাশে সর্বদা থাকেন। তাই এই অঞ্চলের ফৌজি এবং সাধারণ মানুষের কাছে মন্দিরটি খুবই পবিত্র ও প্রিয়।

নতুন বাবা মন্দিরে যখন পৌঁছলাম তখন প্রচণ্ড বাতাস বইছে। ঠাণ্ডায় কাঁপছি। পর্যটকদের প্রবল ভিড়। মোবাইলে ছবি নিয়ে এই জায়গায়র স্মৃতি ধরে রাখলাম। নতুন বাবা মন্দির থেকে চীন সীমান্তের দিকে রাস্তা গিয়েছে। আমরা যেহেতু লিংতাম থেকে আসছি গ্যাংটকে, তাই নতুন বাবা মন্দির থেকে ডানদিকে পড়বে নাথুলা বাজারের রাস্তা। নাথুলার দিকে আমাদের ভ্রমণের পোগ্রাম ছিল না। ফলে আমাদের গাড়ি গ্যাংটকের পথেই ছুটতে লাগলো। এখানকার রাস্তা খুব সুন্দর। মনে হল রাস্তাটি নতুন তৈরি হয়েছে। দুদিকের পাহাড়ের রুপ-সৌন্দর্য শুধু অনুভবের, উপলব্ধির। আরও কিছুক্ষণ সামনের দিকে যাওয়ার পর দেখলাম কালাপোখরি লেক। নাথুলা পাস ছাড়িয়ে পরবর্তী দর্শনীয় স্থান সাঙ্গু লেক। ১২,৪০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত টলটলে নীল জলের সরোবরটি ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে সরোবরের জলে ইতস্তত ভেসে বেড়াচ্ছে পরিযায়ী পাখির দল। বেশ কিছু নারী-পুরুষ চমরী গাই চড়িয়ে পর্যটকদের আনন্দ দিয়ে কিছু রোজগারের চেষ্টা করছে। নানা রঙের ফিতে এবং কাপড়ে সাজানো চমরীর আরোহী হয়ে অনেকে আনন্দ উপভোগ করছেন। প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ লেকটির গভীরতা প্রায় ৫০ ফুট। শীতকালে এই লেকের জল জমে জমাট বরফ হয়ে যায়। তখন পর্যটকরা তার উপরে ছোটাছুটি করে, খেলা করে যথেষ্ট মজা উপভোগ করে। লেকের দুই দিকের পাহাড় ন্যাড়া-ন্যাড়া হলেও খাঁজ কাটা উচ্চতায় দারুণ সুন্দর; যেন রাজপ্রাসাদ মনে হয়। লেকের কাছেই আছে সাঙ্গু মার্কেট। এখানকার দোকানগুলিতে চীনা জ্যাকেট, উইণ্ডচিটার, টুপি, পুতুল, জুতো ও আরও অন্যান্য জিনিসপত্র পাওয়া যায়। সময়ের অভাবে আমাদের আর চমরী গাই চাপা হল না। জিনিপত্রের দাম বেশির কারণে আমাদের কেউই কেনাকাটায় উৎসাহ দেখালো না। আমার একার জন্য ড্রাইভার সময় দিল না। অতএব কিছু না কিনেই খচ খচ মন নিয়ে গাড়িতে বসলাম।

গাড়ি ছেড়ে দিল। এবারের ডেস্টিনেশন গ্যাংটক। পড়ন্ত বিকেল। আঁকাবাকা- চড়াই- উৎরাই পাহাড়ী রাস্তা। মনোরম দৃশ্য। অপূর্ব! অসাধারণ! পশ্চিম আকাশের রোদের কিরণ পাহাড়ের কপালে- কপালে চুমু খেয়ে বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছে। চোখে আরামের সঙ্গে বুকে ভয়ও লাগছে। গ্যাংটক আসার পথে আরও দু-একটা লেকের দেখা মিললো। সেখানে ছোট ছোট মাছেরা খেলা করছে। আরও প্রায় দেড় থেকে দুই ঘণ্টা পাহাড়ী রুপ-সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে পৌঁছে গেলাম গ্যাংটক বাসটার্মিনাল। আমাদের গাড়ির সকলেই ক্ষুধায় কাতর। খুবই ক্লান্ত। সেখান থেকে আবার ছোট ট্যাক্সিতে করে পৌঁছলাম গ্যাংটকের হৃদ- বিন্দু m.g.marg বা m.g road । কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর একটা বাঙালি হোটেলে বেশ চড়া দাম দিয়ে

লাঞ্চ সেরে নিলাম। অতঃপর ঠাঁই নিলাম একটা হোটেলে। এই হোটেলেই কর্মরত আমারই এলাকার এক বাঙালি ছেলে। শরীর আর চলছে না। একটু বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়লাম গ্যাংটকের মার্কেট দর্শনে, চলতি পথে টুকটাক কিছু কেনাকাটা সারা হল। রাত সাড়ে নটায় আবার খেতে বার হলাম। রাত সাড়ে দশটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। এক ঘুমে ভোর হয়ে গেল।

গ্যাংটক শহরটা পুরোটা দেখার সময় না পেলেও যেটুকু দেখেছি তাতে বেশ ভালো লেগেছে। এখানকার দোকানগুলো যথেষ্ট অভিজাত মনে হলো। প্রচুর বাঙালি পর্যটক ও ব্যবসায়ী এখানে দেখা গেল। আছেন বাংলাদেশী পর্যটকও। তাছাড়া বিহারি ব্যবসায়ীরাও এখানে বিভিন্ন ব্যবসায় যুক্ত। মহাত্মা গান্ধীর পাদদেশে দাঁড়িয়ে গান্ধীজীকে সাক্ষী রেখে তোলা ছবিগুলো হৃদয়ের অ্যালবামে সাজানো থাকবে আজীবন।

পরের দিন আমাদের দার্জিলিংয়ে পৌঁছানোর কথা। কিন্তু সেদিন ছিল দিওয়ালী আর ভাইফোঁটা। গোটা সিকিমবাসীর উৎসবের দিন। এই দিনগুলোতে তারা কোন কাজ করে না। সরকারী বাস সার্ভিস বন্ধ। প্রাইভেট বাস রাস্তায় নেই। অন্যান্য গাড়িও পাওয়া যাচ্ছে না। মহা বিপদে পড়া গেল। কয়েকটি টুরিস্ট এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোন লাভ হল না। কোন ড্রাইভারই সেদিন কাজ করতে চায় না। এই দিনটাতে তারা পরিবারের সঙ্গে কাটাতে চায়। কিন্তু ভ্রমণ সূচী অনুযায়ী যথাযথ সময় দার্জিলিংয়ে পৌঁছাতে না পারলে ভ্রমণের সব পরিকল্পনা সম্পন্ন করা যাবে না। যাইহোক, শেষমেষ এলাকার ছেলে হোটেল বয় সীতারামের সহযোগিতায় একটা টাটা সুমো পাওয়া গেল। ভাড়া অনেক বেশি। এক্ষেত্রে, সীতারামের যে কিছু উপরি পাওনা আছে তা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। পৃথিবীর যেখানেই বাঙালী থাকুক না কেন, বাঙালীর চরিত্র প্রায় একই থেকে যায়, মন বদলায় না; অগত্যা বেশি ভাড়াতেই রাজি হলাম। সীতারামকে ধন্যবাদ।

সকাল ৬.২০ তে গাড়ি ছাড়লো। বিদায় গ্যাংটক, গ্যাংটকের ঘোরানো-পেঁচানো রাস্তা বেশ ভালো। ক্রমশ- নীচের দিকে নামছি। কথায় কথায় ড্রাইভার কুমারের সাথে বেশ আলাপ জমে উঠলো। সে পাহাড়ের নানান দৃশ্য আর ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিবরণ দিতে দিতে গাড়ি ছুটাচ্ছে। গ্যাংটকের অদূরে বৌদ্ধ মঠ, সিকিম মনিপাল ইউনিভার্সিটি এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দৃশ্যত অনুভব করছি। তিস্তা নদীর কিনারা সংলগ্ন প্রলম্পিত বরাবর রাস্তা। তার এক ধারে পাহাড়, জঙ্গল, গাছ- গাছালি আর অপর পারে পাহাড়ী খাঁজ,পাহাড়ী- উপত্যকা, কুয়াশার চাদর, রোদ- ছায়ার খেলা, খরস্রোতা নদীর দূরন্ত

প্রকৃতি পশ্চিমবঙ্গকে এত সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি দিয়েছে, যে পৃথিবীর আর কোথাও সৌন্দর্যের এত বৈচিত্র্য আছে কী না আমার জানা নেই। একই রাজ্যের এক মাথায় পাহাড় এক মাথায় সাগর ও পৃথিবীর অন্যতম ঐতিহ্য সুন্দরবন, মাঝখানে সমতলভূমি এবং অসংখ্য নদীনালা, টিলা, মালভূমি ও সোনার ফসল; সর্বোপরি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ঐশ্বর্যশালী বাঙালী।

স্রোতের ছলছল বাজনায় আমি মোহাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি। গাড়ি ছুটছে। পাহাড়ের কোলে কোলে ওষুধ তৈরীর কারখানা। মানুষের আনাগোনা লক্ষ করা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে চাষের জমিতে মাথা নত করে আছে সোনালী ধানের শিস। পৌঁছে গেলাম রংদো বাজারে। এখানে একটু হালকা টিফিন করে নিলাম। তিস্তার দামাল স্রোত ছুটছে সাগরের পানে। তার স্রোতের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটছে আমাদের গাড়ি। এক সময় চলে এলাম দার্জিলিং সীমান্তে বর্ডারে।

পশ্চিমবঙ্গের অফিসে ট্যাক্স জমা দেওয়ার পর আবার গাড়ি ছাড়লো। প্রকৃতি পশ্চিমবঙ্গকে এত সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি দিয়েছে, যে পৃথিবীর আর কোথাও সৌন্দর্যের এত বৈচিত্র্য আছে কী না আমার জানা নেই। একই রাজ্যের এক মাথায় পাহাড় এক মাথায় সাগর ও পৃথিবীর অন্যতম ঐতিহ্য সুন্দরবন, মাঝখানে সমতলভূমি এবং অসংখ্য নদীনালা, টিলা, মালভূমি ও সোনার ফসল; সর্বোপরি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ঐশ্বর্যশালী বাঙালী।

নানান কথাবার্তা এবং ভাববিনিময়ের মাধ্যমে ড্রাইভার কুমার যেন আমাদের অতি পরিচিত জন হয়ে গেল। সামনেই

পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার একজন পুলিশের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিল। গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুমার (ড্রাইভার) আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো, ''বাঙালী পুরুষরা শুধু রাস্তায় হাত পেতে দাঁড়ায়। ওদের কোনদিন অভাব ঘোঁচে না। ওদের হাতে কালো ব্যাগ থাকে। এদের পেট কালো টাকায় ভর্তি হয়।''

কথায় কথায় কুমার আরও যা যা বললো তা শুনে আমাদের যথেষ্ট খারাপ লাগলেও এই একই কথা বংলার বাইরে অন্যান্য রাজ্যে বাঙালীদের সম্বন্ধে হামেশাই শোনা যায়। যাইহোক, কুমার একটা কথা জোর দিয়েই বললো– ''সিকিমে কোন চোর নেই। বাঙালীরা শিক্ষায় এগিয়ে কিন্তু ঠকবাজিতে ওস্তাদ''।

আমার স্মৃতি ফিরে গেল একটু পিছনে। কুমারের এই কথাটিই শুনেছিলাম লিংতামের রিসর্ট মালকিনের মুখে, তিনিও বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন– ''সিকিমে কোন চোর নেই''। তাদের এই আত্মগরিমার কথা শুনে সিকিম সম্বন্ধে আমার ভালবাসা বেড়ে গেল।

এবার আমি কথায় কথায় কুমারের কাছে জানতে চাইলাম– ''আপনাদের সরকার জনগণের স্বার্থ কেমন দেখে? অর্থাৎ জনদরদী কি- না?'' সে তো ক্ষেপে গেল। রাগান্বিত স্বরেই জানালো– ''মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বাঁদরের মতো নাচাচ্ছে। আমরাও নাচছি।'' একটু থেমে সে আবার শুরু করলো– ''কোথাও কোন অব্যবস্থা হলে বাঙালীরা তবুও একটু হৈ চৈ করে, চ্যাঁচামেচি করে, আর আমরা সিকিমিরা সব সহ্য করি নীরব দর্শক হয়ে, সব কিছুই মেনে নিই''।

তার ভিতর থেকে শুধু কথা বেরিয়ে আসছে। হঠাৎ করেই সে বললো–''দিল্লীর সরকার সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করেনি। প্রধানমন্ত্রীর শুধু লেকচার আছে ''ভাই ও অর বহিনো, আর সব ফাঁকা''। আমি বললাম কেন স্বচ্ছ ভারত করছে, আরও কত কী করছে। কুমার বেশ আওয়াজ করেই হেসে উঠলো। এবার একটানা বলে চললো ''স্বচ্ছ ভারত না আরও কিছু। আর্থিক কেলেঙ্কারীর নোংরামি হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর শুধু বিজ্ঞাপন হচ্ছে''। ড্রাইভার কুমার বেশ রসিক বলেই মনে হল।

গাড়ি ছুটছে, কিন্তু কুমারের গল্প ফুরাচ্ছে না। কথায় কথায় জেনে নিলাম সে B.A পাশ করেছে। কিছুদিন চাকরি বাকরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। তাই সরকারী ব্যবস্থার প্রতি তার প্রচণ্ড ক্ষোভ আছে। শেষে জীবিকার টানে সিকিমের যে কমন বিজনেস, পরিবহন ব্যবসায় ঢুকে পড়েছে। একটা tata sumo আর একটা alto গাড়ি তার সংসার চালানোর মাধ্যম। গল্প করতে করতেই সে জানালো– '' আমাদের পূর্বের মুখ্যমন্ত্রী হাজার হাজার কোটি টাকা বস্তায় ভরেছে আর বিদেশের ব্যাঙ্কে পাচার করেছে।''

আমি বললাম যে, এখন তো অন্যদলের সরকার, অন্য মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় আছেন। ইনি কেমন রাজ্য চালাচ্ছেন? কুমার আরও রেগে গেল। এবার বলতে শুরু করলো, ''তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। বাড়িতে ছেলেমেয়ে অপেক্ষা করছে। আজ দিওয়ালীর উৎসব (ভাইফোঁটা)''। সে আরও যোগ করলো– ''সব মুখ্যমন্ত্রীই এক। এখন যিনি আছেন তিনি তো দিল্লীর পুতুল। পাঁচ বছরে হাজার- হাজার কোটি টাকা গুছিয়ে নেবে। ছেলেমেয়েদের বিদেশে লেখাপড়া শিখিয়ে সেখানেই settle করবে।''

গ্যাংটক থেকে দার্জিলিংয়ের পথে প্রায় হাফ রাস্তা চলে এসেছি। বেশ ক্ষিদে পেয়েছে। আমাদের দলনেতা, প্রধান শিক্ষক বন্ধুবর জিয়াউল সাহেব রাস্তায় বেরলেই শুধু খাব খাব করে। অতএব, আমাদের গাড়ি থামলো রাস্তার ধারে এক রেস্টুরেন্টের সামনে। হালকা কিছু টিফিন করে স্বস্তি পাওয়া গেল।

জায়গাটির প্রাকৃতিক পরিবেশ অসাধারণ সুন্দর। একেবারে পাশেই তিস্তা নদীর গভীর গিরিখাত। পাথুরে পাড় বেয়ে জলপ্রপাত বা ঝরনার ছাপ স্পষ্ট। অপর পাড়ের অদূরে মাথা উঁচু করে আছে হিমালয় শ্রেণীর রহস্যঘন রুপ। রাস্তার বা নদীর বামদিকে মনোহরা প্রাকৃতিক পবিবেশ। ওখানে রেস্টুরেন্টে পরিচয় হল এক বাঙালী বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি সিকিমের হোটেলে কাজ করেন। কিন্তু কাজ কম থাকলে বিভিন্ন হোটেল-রেস্টুরেন্টে ক্ষেপ কাজ করেন। জানতে চাইলাম, মাইনে যা পান তাতে সংসার চলে? খুব অসহায়ভাবে তিনি জানালেন– ''কী করবো বাবু, বয়স হয়েছে তো; আর তেমন কোন কাজ করতে পারি না। এখানে থাকা, খাওয়া ফ্রি। যেটুকু পাই পুরোটাই বাড়িতে পাঠাতে পারি। বাড়িতে দুটো বিয়ের লায়েক মেয়ে আছে। তাদেরই কথা ভেবে তাদের ছেড়ে এতদূরে পড়ে আছি''। ভদ্রলোকের বাড়ি কলকাতাদ্দ দমদম এলাকায়।

গাড়ি আবার ছাড়লো। আমি কুমারের কাছ থেকে শুধু রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও আর্থিক বিষয়ে সেই এলাকার অবস্থা ও মনোভাব সম্বন্ধে কথা বার করতে চাইছি। তাই সরাসরি

তার কাছে প্রশ্ন রাখলাম– ''বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিংয়ের উন্নতির জন্য কেমন কাজ করছেন বলে আপনার মনে হয়?'' তার চটপট উত্তর– ''এখানেও কেন্দ্র বা রাজ্য কোন কাজ করেনি''। আমি বললাম, কেন? এখানে তো দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্র সরকারের রাজনৈতিক মতাদর্শের সাংসদ বা পার্লামেন্টের নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছেন; তাও কাজ হয়নি কেন? কুমারের উত্তর– ''তিনি এখানে all time থাকেন না। সাগরেদদের দিয়ে কাজ করায়, তারা সব হিস্সা খেয়ে নেয়, ultimate কোন কাজই হয় না। tourist -রা না এলে এখানকার মানুষজন না খেয়ে মারা যাবে।''

এবার সে মজা করে বললো– ''দিল্লীর বাবু আর কলকাতার বিবি দুজনেই সাংসারহীন। তাই তাদের বিয়ে দিলে হয়তো দেশ ভালো চলবে''। কথাগুলি বলেই সে হাসিতে ফেটে পড়লো। হাসি থামিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ হয়ে গেল। তারপর সিরিয়াস ভাবে মৃদুস্বরেই বললো–''পাহাড়ী মানুষের দুঃখে কেউ কাতর হয় না। তাদের কান্না কেউ শোনে না''। যেটুকু করে শুধু ভোটের দায়ে করে''। ড্রাইভার কুমারের আত্মাভিমানের এই কথাগুলো শুনে আমার মনটাও পাহাড়ী আত্মার গভীরে ডুবে গেল।

গাড়ি ছুটছে। বেলা বাড়ছে। পথ যেন আর শেষ হয় না। তিস্তার বাঁকে বাঁকে পরতে পরতে উচ্ছলিত সুন্দর। গম্ভীর পাহাড় থেকে ভেসে আসছে ঝমঝম সুরের মাতন। মন যেন কৈলে বাছুরের ন্যায় ছুটে বেড়াচ্ছে। দার্জিলিংয়ের আরও কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। বাম হাতে পাহাড়ী গাছ- পালা মিলেমিশে একাকার। মানুষ যদি এমনতর মিলেমিশে আপনজন হয়ে থাকতে পারতো তাহলে কতই না ভালো হত। রাস্তার ধারে ধারে বাঁকে-বাঁকে ইতিউতি ছোট- খাটো বাজার, সব্জীর দোকান। মানুষের খুব একটা ভিড়ভাট্টা দেখা গেল না। পথমধ্যেই ড্রাইভার একসময় হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল, ''ওইখান দিয়ে রেললাইন তৈরি হচ্ছে।'' আমি জানতে চাইলাম, 'লাইন পাতার কাজ কতদিন হলো?' উত্তরে সে জানাল, অনেক বছর হয়ে গেছে। আমি বললাম 'খুব ভালো হচ্ছে। এলাকার মানুষের উন্নতি হবে'। একটা ব্যাঙ্গের হাসি হেসে কুমার জবাব দিল, 'এই রেল যবে চালু হবে ততদিনে আমাদের উপরে যাবার সময় হয়ে যাবে'। খিলখিল হাসিতে ভরিয়ে দিয়ে আরও বললো, 'ভালোই হবে রেলে করে উপরে যেতে পারবো।'

দীর্ঘপথ কুমারের বিভিন্ন কথোপথনের মাধ্যমে আমার মনে হয়েছে যে, কুমার দেশের ইতিহাস, রাজনৈতিক অবস্থা, পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল। তাকে বললাম, আপনি যে এত জানেন, রাজনীতি করলে বেশ উন্নতি করতে পারতেন। সে দৃঢ়তার সঙ্গে জানালো-- ''আমি মিছিলে হাঁটি না। পরিবারের খিদে মেটানেরা জন্য গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামি''। সত্যি কথা বলতে কী, তার সর্বজ্ঞানী মানসিকতায় আমি এবং আমরা মুগ্ধই হয়েছিলাম। তাকে আমার বেশ ভালোই লেগেছিল।

''বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিংয়ের উন্নতির জন্য কেমন কাজ করছেন বলে আপনার মনে হয়?'' তার চটপট উত্তর– ''এখানেও কেন্দ্র বা রাজ্য কোন কাজ করেনি''। আমি বললাম,কেন? এখানে তো দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্র সরকারের রাজনৈতিক মতাদর্শের সাংসদ বা পার্লামেন্টের নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছেন; তাও কাজ হয়নি কেন? কুমারের উত্তর– ''তিনি এখানে all time থাকেন না। সাগরেদদের দিয়ে কাজ করায়, তারা সব হিস্সা খেয়ে নেয়, ultimate কোন কাজই হয় না। tourist-রা না এলে এখানকার মানুষজন না খেয়ে মারা যাবে।''

কুমার পড়াশুনায় ভালো ছিল। জোরে একটা শ্বাস নিয়ে বললো, ''জানেন স্যার, অনেক কষ্টে সংসারটা চালাই। আপনাদের টুরিস্টদের ভরসায় আমরা বেঁচে থাকি। তাও অফ সিজেনে ভালো আয় হয় না। আমাদের পাহাড়ী মানুষদের যে কত কষ্ট তা আপনারা বুঝবেন না স্যার।'' এই প্রথম তাকে একটু অন্য রকম লাগলো। তাকে একটু ম্রিয়মান মনে হল। আবার একটা দম ফেললো। তার কথার সূত্র ধরে হঠাৎ করেই বলে ফেললাম– ''বিশাল দেশ ভারতবর্ষ। অন্যত্র settle হতে পারেন। 'কোথায়'? সে জানতে চাইলো। বললাম– আপনার

যেখানে পছন্দ। সে আমার দিকে একটু শক্তভাবে তাকালো। আমি আবার যোগ করলাম– না, মানে, বিভিন্ন মানুষ তো বিভিন্ন জায়গায় জীবন- জীবিকার জন্য চলে যায়, তাই আপনিও সে.....র.....ক.....ম – কিছু ভাবতে পারতেন আর কী। আমার কথাগুলো শুনে কুমার হাসলো। তারপর তার বক্তব্য উপস্থাপন করলো– ''তাতে নয় আমার সমস্যার সমাধান হবে হয়তো বা, কিন্তু সব পাহড়ী মানুষের সমস্যার সমাধান হবে কী? তারা কোথায় যাবে? রোগ ভিতর থেকে না সারিয়ে আপনি উপরে মলমের প্রলেপ দিয়ে রোগ সারানোর কথা বলছেন''। তার কথা আমাকে বেশ ধাক্কা দিল। খানিকটা মৃদুস্বরে আমিও জানালাম– 'তা আপনি ঠিকই বলেছেন'। বেশ গর্বের সঙ্গে সে বললো– ''এদেশ ছেড়ে যাব না। দেশের মাটি কখনো বেইমানী করে না। বিশ্বাসঘাতকতা করি আমরা আর দেশের নেতারা।''

গাড়ির মধ্যে অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। দার্জিলিংয়ের অনেকটা ভিতরে চলে এসেছি। গাড়ি ক্রমশঃ ৪৫ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে উপরে উঠছে। দুদিকে পাহাড়, পাহাড়ী খাদ সব মিলিয়ে শিহরিত পরিবেশ। শীতের পোশাক পরে আছি। তবুও বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। প্রত্যেকটা বাঁক থেকে দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। মেঘ রোদের খেলা চলছে। মাঝে মাঝে ঘন কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে চারিদিক। গাড়িতে বসেই ছবি তুলছি। ইতিমধ্যে অনেকটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পৌঁছে গেলাম তিস্তা বাজার। ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললাম। সে কিন্তু গাড়ি থামালো না। গাড়ি একেবারে থামলো ত্রিবেণীর সঙ্গমে। নেমে ওয়াচ টাওয়ারে গেলাম। তন্বী তিস্তার সঙ্গে এসে মিশেছে রঙ্গীতা নদী। তাদের মিলিত ধারা চলে গেছে বাংলাদেশের দিকে অন্য নাম নিয়ে। আবার একটু হালকা টিফিন সেরে নিলাম। তারপর এক সময় পৌঁছে গেলাম ঘুম স্টেশন। ট্রয় ট্রেনের গল্প শুনেছি। এই প্রথম দেখলাম। ঐতিহ্যকে স্পর্শ করলাম। এক সময় পৌঁছে গেলাম দার্জিলিংয়ের সরকারী বাস টার্মিনাসের জায়গায়। ক্লান্ত পায়ে পৌঁছলাম নির্দিষ্ট হোটেলে। স্নান সেরে নিলাম। রান্না একটু দেরিতে হল। একটু পরেই তৃপ্তি করে খেলাম। রান্না-বান্না খুব ভালো। এবার বিশ্রামের পালা। সেদিন আর তেমন কোন programe ছিল না। বিকালের দিকে পায়ে পায়ে ঘুরলাম দার্জিলিং বাজার। দলবেঁধে সন্ধ্যার সময় পৌঁছলাম মাল-এ।

মাল যেন এক মিনি ভারত বা মিনি পৃথিবীও বলা যায়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভ্রমণার্থীদের এখানে আগমন ঘটে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পর্যটকদেরও এখানে বেশ ভাল সংখ্যায় লক্ষ করা গেল। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে ঠাণ্ডার ভালোই দাপট আছে। পাহাড়ের গায়ে জড়ানো ঘন কুয়াশা। মাল-এর বাঁধানো অনুষ্ঠান মঞ্চে এবং তার সামনের প্রাঙ্গনে ইতস্ততঃ ভালোই ভিড় আছে। অনুষ্ঠানের স্থায়ী মঞ্চের সামনে সগৌরবে অধিষ্ঠিত পূর্ণাবয়ব কবি ভানুভক্ত। হ্যালোজেন বাতির অলোয় পুরো এলাকাটা যেন জ্বল জ্বল করছে। মঞ্চে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে একজন কর্মকর্তার সমীপে স্বরচিত কবিতা পাঠ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। তিনি বললেন '' প্রচুর পার্টিসিপ্যান্ট। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাই সকলের সুযোগ দেওয়া যাবে না।'' অতএব, রণেভঙ্গ কবি ভানুভক্তকে সাক্ষী রেখে অনেকগুলি ছবি তুললাম। তারপর বাজার মুখি হলাম। এবার আমাদের দল যে যার মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কেনাকাটা আমার ভীষণ শখ। আমি একা একা পছন্দের জিনিস কেনাকত্রটা করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। বাজার ঘুরতে ঘুরতে, বাড়ির বিভিন্ন সদস্যদের বিভিন্ন সাইজের এবং হরেক কিসিমের সামগ্রী কিনতে কিনতে এক সময় হারিয়ে গেলাম।

এখানকার বাজারের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, একদিকে বড়বড় ব্যবসায়ীদের অভিজাত দোকান, আর এক দিকে ফুটপাতে সরুসরু ঘুমটির মধ্যে ছোট ছোট অস্থায়ী দোকান। ঘুমটি দোকানগুলোর প্রায় সবাই ভুটিয়া বা নেপালি এবং বিক্রেতরা হলেন মহিলা দোকানী। তাদের মধ্যে যুবতী, বৃদ্ধা বা অতিবৃদ্ধা দোকানীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। এই সব দোকানের বেশির ভাগ উপকরণই হল পোশাক আশাক বা সাজ-সজ্জার জিনিসপত্র। ফুটপাতের দোকানগুলিতে প্রচুর দামাদামি করে কিনতে হয়, না হলে ঠকতে হয়। যে দাম চাইবে তার প্রায় হাফ দামে আপনি খরিদ করতে পারবেন। ৮০০ টাকা চেয়ে ৪০০ (চারশো) টাকায় বিক্রি করতে রাজি হওয়া অতিবৃদ্ধা এক দোকানীকে জিজ্ঞেস করলাম; ''আপনারা এত বেশি দাম চান কেন?'' সেই মহিলা দোকানী আধা হিন্দি-আধা বাংলায় বললেন ''আপনি কি ৮০০ (আটশো) টাকা দিয়েছেন? যেহেতু আমরা ফুটপাতে বসি তাই আমরা যে দামই বলি না কেন খরিদ্দার কম বলবেই। সে কারণে আমাদের একটু বেশি বলতে হয়। আমাদের দেশে এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।'' কথা চলছে। সেই ভদ্র

মহিলা জানালেন যে, দার্জিলিংয়ে যখন season শেষ হয় অর্থাৎ নভেম্বরের ১৫ তারিখ থেকে ফেব্রয়ারী মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত তারা ব্যবসার শীত সামগ্রী নিয়ে চলে আসে কলকাতায় এবং দেশের বিভিন্ন ছোট বড় শহরে।

শেষমেষ ফুটপাত ছেড়ে দিয়ে বাজারের অভিজাত দোকানের দিকে মনোনিবেশ করলাম। ঘুরতে ঘুরতে অনেকটাই রাত হয়ে গেল। মাল-এর অনুষ্ঠান মঞ্চে তখনও অনুষ্ঠান চলছে। ঠাণ্ডা ভালোই থাবা বসাচ্ছে। হঠাৎ করেই সঙ্গীদের সাথে দেখা হয়ে গেল। তারাও অনেক কিছু কিনেছে। সকলে মিলে চা খেলাম। পায়ে পায়ে পৌঁছলাম hel new manzil. ফ্রেস হবার পর সকলে মিলে আড্ডা হল। রাত সাড়ে দশটায় হোটেল বয়রা খাওয়ার জন্য ডাকলেন। ডাল, বেগুন ভাজা, কপি আলুর তরকারি, ডিমের ঝোল, চাটনি-পাঁপড়-মিস্টি সহযোগে দারুন খেলাম। রাঁধুনীর কথা একটু বলি। তার বয়স খুব বেশি হলে ১৪-১৫ বছর হবে। অসাধারণ রান্না শিখেছে ছেলেটি। অন্য হোটেলে সে প্রধান রাঁধুনীর সহযোগী ছিল। অন্যান্য বয়রা মিলে নিবিড় আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের যত্ন- খাতির করলো। তারা সকলেই দার্জিলিংয়ের উপকণ্ঠে অবস্থিত আলিপুর গ্রামের ছেলে। পরের দিন তারা দেশী মুরগীর মাংস খাওয়ানোর আশ্বাস দিল। অনেক রাত হয়ে গেছে। অতএব শুয়ে পড়লাম। কাল সকাল সকাল উঠতে হবে। পরের দিন গন্তব্যস্থল- দার্জিলিংয়ের 7 points.

রাতে তৃপ্তির ঘুম হল। সকালে চা খাওয়ার পর চান টান সেরে নিলাম। ড্রাইভার ডাকাডাকি করছে। তাড়াহুড়ো করে টিফিন পর্ব মেটানো হল। ১৫ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম The Zoo of Darjeelling and Mountaring institution। ড্রাইভার সময় দিলেন একঘণ্টা। টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করলাম। এই মিউজিয়ামের বিভিন্ন অংশ ভালোভাবে দেখতে হলে এক ঘন্টা সময় যথেষ্ট নয়। প্রবেশ পথের ধারেই বাঘেদের আস্তানা। ইতস্তত দেখা গেল দুটো বাঘ। অনেক ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়ে বাঘ বাবাজীর কয়েকটি ছবি তুললাম। পরপর বিভিন্ন প্রাণীদের দেখার পর পৌঁছে গেলাম তেনজিং নোরগের মূর্তির সামনে। তিনি আজ ইতিহাস। তাঁকে সাক্ষী রেখে আবার ক্যামেরার ফ্লাস ঝকমকিয়ে উঠলো। দেখা হয়ে গেল একজন ইতালিয়ান পর্যটকের সঙ্গে। তাঁর নাম জেমস্। ষাটের আশেপাশে বয়স হবে। তাঁর সঙ্গে ছবি তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই বিনাদ্বিধায় তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। অন্যদেশের মানুষ জনের সঙ্গে ছবি তোলার ব্যাপারে ইউরোপ-আমেরিকার ভ্রমণার্থীরা খুবই লিবারেল। আমার এই কথার প্রমাণ বেশ অনেকবারই পেয়েছি আমি আগ্রা দিল্লী, ফতেপুর সিক্রী বা কাশ্মীরে। ঘুরতে ঘুরতে আরও বিভিন্ন কর্ণার দেখার পর পৌঁছে গেলাম মূল আকর্ষণ আর্কাইভ বা 'art gallery'-তে। সমগ্র সিকিমের এবং দার্জিলিংয়ের পাহাড়ী পথের মানচিত্র এবং 'Mount Everest'-এ আরোহণের বিভিন্ন ছবি ও রেকর্ডের সংগ্রহশালা এটি। এখানে ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নেতা এবং মহাপুরুষদের আগমণের ছবি ও আরও আকর্ষণীয় সব ইতিহাস কালপঞ্জী অনুযায়ী সাজানো আছে, যা সত্যিই অনেক শিক্ষণীয়, ভোলার নয়। সেখানেও কিছু ছবি নিলাম। কিন্তু কর্মরত তত্ত্বাবধায়কদের আপত্তিতে সব ছবি 'delete' করে দিতে হল। মন্তব্যের খাতায় লিখলাম– ''অসাধারণ, শিক্ষণীয়, স্মৃতি মধুর, খুব ভালো লেগেছে। আবার আসবো''।

সেখান থেকে বেরিয়ে বাইরের লনে, যেখানে কাঞ্চনজঙ্ঘার শ্বেত পাথরের 'replica' আছে তার সামনে ছবি নিলাম। এর ঠিক পিছন দিক থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে খুব কাছে। যেন একটু ছুটলেই নাগালের মধ্যে আসবে।

এবার গেলাম আর একটা গ্যালারিতে। সেখানে বিভিন্ন কীট- পতঙ্গ আর পশু- পাখিদের জীবাশ্ম বা মাথা, সিং, চামড়া, পা, দাঁত ইত্যাদি সাজানো আছে। বাচ্চাদের খুবই ভালো লাগবে। মনে মনে ভাবলাম, ছেলে মেয়েদের নিয়ে আরও যতবার সম্ভব ততবার আসবো। ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছলাম পাখিরালয়, সেখানে দেখা হল নিউজিল্যাণ্ড থেকে আসা এক ভ্রমণার্থীর সঙ্গে। তাঁর নাম বাটলার। বেশ বয়স্ক। মাথার চুলের রঙ কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো সাদা। তিনি অধ্যাপনা করেন। তিনি জীবজন্তু ও পশুপাখিপ্রেমী। তাঁর কাঁধে হাত রেখে ছবি তুললাম। অচীরেই তিনি নিশ্চয়ই দেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু তাঁর কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। মনে থাকবে।

ইতোমধ্যে গাড়ির ড্রাইভার ফোনে ফোনে তাড়া লাগাচ্ছে। আমার হাঁটুর লিগামেণ্ট অপারেশন। পাহাড়ী পথে হাঁটতে হাঁটতে আমিও বেশ ক্লান্ত। এবারে গেলাম সাপের গ্যালারিতে। সময় তাড়া দিচ্ছে। অতএব গেটের দিকে এগোতে হল। বাইরে আসার পথে দেখি এক বাঘ মামা অলসভাবে শুয়ে শুয়ে রোদ

পোহাচ্ছে। তার ছবি তুললাম। আলমোড়া ভেঙে বাঘটি এমন ভাবে তাকালো যে, আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। রক্ষে এই যে, মুহূর্তের দেখা দিয়েই তিনি তার ডেরায় ঢুকে গেলেন। গেটের একেবারে কাছে পৌঁছে গেছি। সেখানে দেখা হল এক ইতালীয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে। বেটে-খাঁটো মোটা সোটা চেহারা। ইনিও বয়স্ক। মাথার চুল সাদাকালোয় ভরা। তাঁর সঙ্গে আলাপ জমালাম। ভাব বিনিময় হল। স্মৃতি রাখার জন্য তাঁর হাতে হাত রেখে ছবি নিলাম। আমি আমার মতো করে ইংরেজীতে কথা বলা শুরু করলে, তিনি বেশ জোর দিয়েই বললেন–

"I am an Italian and I don't know English" আমি একটু অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকলাম। তারপর ভাবনার জগতে ডুবে গেলাম। বাঙালী অভিভাবকরা এত দ্রুত বাংলা ভুলতে চাইছে, ইংরেজীর প্রতি অন্ধ আনুগত্যে ঝুঁকে পড়ছে যে, একদিন হয়তো গবেষণা করে বলতে হবে যে বাঙালীর মাতৃভাষা ছিল বাংলা।

টিফিন খেতে খেতেই গাড়িতে চেপে বসলাম। গাড়ি পৌঁছালো রোপ ওয়েতে। লাইনে প্রচুর ভিড়। অতএব 'Rope way' চাপার ইচ্ছা বাতিল করে এগিয়ে চললাম নিবেদিতা ভবনের দিকে। পাশের Car জোনে গাড়ি থামলো। ড্রাইভার পাশের ভবনটার দিকে আঙুল নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করলো– ''এখানে কে থাকে? উত্তর দেওয়ার আগেই আবার জানতে চাইলো– ''এটা কী কোন কারখানা?" আমি তো অবাক! চমকে উঠলাম। ভাবছি-এরা তো এখানকার ভূমিপুত্র। তবুও এরা জানে না যে, ভগিনি নিবেদিতা এই বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। এই বাড়িতেই ভারত-গৌরব বিবেকানন্দ থাকতেন। যাই হোক, ভাবতে ভাবতেই উঠে গেলাম বাড়ির ভিতরে। এক গৌরবময় ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত জায়গার পরশে ধন্য হলাম। নীচে নেমে এলাম। সেখান থেকে হিমালয় শ্রেণীর শুভ্র শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার ভাবে। সে এক স্বপ্নময় দৃশ্য যেন। সেই পাহাড়ের উপরে-উপরে উড়েবেড়িয়ে সৌন্দর্যের সমস্ত রহস্য প্রাণভরে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে। কিন্তু তা তো হবার নয়। মনের ভাবনা মনেই থেকে গেল। গাড়ির হর্ণ শুনে বুঝলাম সময় হয়ে গেছে। এবার যেতে হবে রক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চা বাগান।

আমরা আর Rock প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নামলাম না। গাড়িতে বসেই দেখে নিলাম। তারপর সোজা চলে গেলাম চা বাগানে। সেখানে ভ্রমণর্থীদের প্রচুর ভিড়। জায়গাটি খুবই সুন্দর। মুগ্ধ করে, দুই পাহাড়ের বিপরীত মুখী ঢাল বা উপত্যকা। ঢালের গায়ে চা-পাতার সবুজের সমারোহ। মাথার উপরে আকাশ ঘন নীল এবং রোদ ঝলমলে। সেখানে পেঁজা তুলোর মেঘের খেলা। রোদের তাপে ঘেমে-নেয়ে একাকার। শীত পোশাক খুলে ফেলতে হল। চা-বাগানে বা পাহাড়ের ঢালে বেশি নীচে নামা যায় না। বাঁশের বাখারির বেড়া দিয়ে ঘেরা। রং-বেরংয়ের বিভিন্ন বয়সী ভ্রমণার্থীরা তাদের খুশী মতো ফটো তুলছে। কলকাতার গড়িয়া থেকে আগত এক 'Young' ডাক্তার দম্পত্তি তাদের ক্যামেরা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো– ''আঙ্কেল আমাদের কয়েকটা ছবি তুলে দিন।" আমি ক্যামেরা বা ছবি বিশেষজ্ঞ নই। তবুও তাদের দেখানো কায়দায় শুট করলাম। তারা খুশীতে ডগমগ হয়ে ধন্যবাদ জানালো। বিনিময়ে আমার মোবাইলটা তাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে কয়েকটি ছবি তুলিয়ে নিলাম। আমার 'ফটোজেনিক ফেস' নয়। তবুও তাদের হাতে তোলা ছবি চিরকাল আমার মনের অ্যালবামে সযত্নে তোলা থাকবে।

পাহাড়ের এক ফাঁকে বাঁশ-বাখারি দিয়ে বানানো এক খুঁড়ে ঘর। সেখানে একদল পাহাড়ী মানুষ পাহাড়ী কন্যা ও পাহাড়ী যুবকদের সাজ-পোশাকের ডালি সাজিয়ে পর্যটকদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। চা তোলা মেয়েদের পোশাক এবং পিটে লম্বাকৃতির বাঁশের জাফরির ঝুড়ির সজ্জার জন্য ৫০ টাকা। এরকম বিভিন্ন সাজের জন্য বিভিন্ন রেট্ আছে। আমাদের সহযাত্রী ২ জন মেয়ে পাহাড়ী চা-বাগানের কাজের মেয়ের সাজে ছবি তুললো। চারিদিকে ক্যামেরার ঝলকানি। দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেছে। খিদেয় পেট চিঁ চিঁ করছে। উপরে উঠে এলাম। স্থানীয় এক দোকানে স্থানীয় চা-পাতার চা খেতে খেতে একটু জিরিয়ে নিলাম। গাড়ি ছেড়ে দিলো। সরাসরি চলে এলাম হোটেলে। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে কম্বল মুড়ি দিয়ে টানা একটা ঘুম দিলাম, সন্ধ্যার একটু আগে উঠে বেরিয়ে পড়লাম বাজারে। এ প্রসঙ্গে একটু বলে রাখি, আমাদের আর এক দলনেতা রসিদ সাহেব একজন Tourist Guide. বছরের বিভিন্ন সময়ে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে পর্যটকদের নিয়ে ভ্রমণ করেন। ১৫ দিন পরেই তাঁর নেতৃত্বে ২৫ জনের একটি দল দার্জিলিংয়ে বেড়াতে আসার কথা। সেকারণে তিনি দার্জিলিংয়ের পথে পথে বিভিন্ন হোটেলে হোটেলে ঘুরে ঘুরে নানাবিধ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিলেন। তাঁর সঙ্গী আমি। দুঃখের কথা,

এখন তিনি আর আমাদের মাঝে নেই। তারপর একসময় পৌঁছে গেলাম দার্জিলিংয়ের 'Toy Train Station' এ। টিকিট পাওয়া গেল না। অনেক আগে থেকেই টিকিট বুক করতে হয়। তাছাড়া, টিকিটের দামও অনেক বেশি। প্লাটফর্মে একটি নয়-দশ বছরের ছেলে টয়-ট্রেন চড়বে বলে ব্যাপক কান্নাকাটি করছে। তার বাবা তাকে বোঝাচ্ছে–

''আমাদের হুগলীর ট্রেন আর এই ট্রেন প্রায় একই, বাবু। শুধু আমাদের ঐখানকার ট্রেন একটু চওড়া আর এই ট্রেন একটু সরু, এই আর কী।" অপারগ বাবার এমন যুক্তিতে ছেলের চোখের জল আর থামে না। যাই হোক, সেখানে থেকে আমরা চলে এলাম MAL- এ। পথিমধ্যে বাড়ির জন্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনে নিলাম; চা, কিছু বেকারি খাবার, ব্যাগপত্র ইত্যাদি। দলের থেকে আমরা দুজন আলাদা হয়ে গেছি। মালের বাজারে যে যার মতো পকেট উজাড় করে কেনাকাটা করলো। পরের দিনই যে বাড়ি ফিরতে হবে। সকলেরই পকেট প্রায় ফাঁকা হবার পথে। হোটেলে পৌঁছে পকেট ঝেড়ে ঝুড়ে বন্ধুবর জিয়াউল তার ভগ্নীপতিকে পাঠালেন তাঁর আরও কিছু আত্মীয় স্বজনের জন্য আরও কিছু কেনাকাটার বরাত দিয়ে। রাতের খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিনের পরিকল্পনা ভোরে কাঞ্চনজঙ্ঘার– 'Rising sun' এবং সেখান থেকে Rock Garden'.

সারারাত ঘুম প্রায় হলোই না। রাত সাড়ে তিনটের সময় উঠে তৈরী হয়ে নিলাম। ঘুম ঘুম চোখে সবাই গাড়িতে উঠে বসলাম নির্দিষ্ট সময়ে। গাড়ি ছুটলো ভোরের কাঞ্চনজঙ্ঘার উদ্দেশ্যে।

আঁধার রাত। অচেনা পাহাড়ী পথ। গাড়ি ছোটাতে ছোটাতেই ড্রাইভার জানালেন, নির্দিষ্ট জায়গা থেকে অনেক দূরে মন্দিরের কাছে গাড়ি থাকবে। ফেরার সময় অনেকটা হেঁটে এসে গাড়িতে উঠতে হবে। অত ভোরে, কনকনে শীতের কামড় দিচ্ছে। তবুও রাস্তায় প্রচুর গাড়ি, প্রচুর মানুষ। প্রচুর বিদেশীও চোখে পড়লো। গাড়ি থেকে নামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীরা হারিয়ে গেল আঁধারে ভিড়ের মধ্যে। কাঞ্চনজঙ্ঘার- 'View Point'-এ লোকে লোকারণ্য। সবাই নামী-দামী ক্যামেরা বা মোবাইল হাতে অপেক্ষারত। কারো মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ পূব আকাশের দিকে। রাতের আঁধার একটু একটু করে ফিঁকে হচ্ছে। পূব আকাশে, পাহাড়ের মাথা কুসুম-কুসুম রঙে রঙীন হচ্ছে। পাহাড় ও আকাশের সন্ধি স্থলে এবং উভয়ের পরতে পরতে বিচিত্র রঙের খেলার প্রতিযোগিতা চলছে। সূর্যদেব খুব ধীরে ধীরে, একটু একটু করে উপরে উঠছেন। দর্শকদের হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে সেই নরম ভোরের পাহাড়ী আকাশ-বাতাস। চারিদিকে ক্যামেরার ঝলকানি। সূর্যোদয়ের বিপরীত দিকে মধুর আলোর বিচিত্র খেলায় মেতে উঠেছে-কাঞ্চন রাণী। শিশু, নারী, পুরুষের আনন্দ-কলতানে মুখরিত সমগ্র ওয়াচ-টাওয়ার এলাকা। চা-ওয়ালাদের বিচিত্র হাঁকে সরগরম ভোরের পরিবেশ। ক্রমে ক্রমে আঁধার ছুটে গেছে। সকালের আলো পরিষ্কার। শীত-পোশাকের দোকানীদের চিৎকারে কেনাবেচার বাজার বেশ সরগরম।

কাঞ্চনের 'Sun rising' দর্শনার্থীরা প্রায় সবাই ভিড় ঠেলে বা দলবেঁধে নীচে নেমে আসছে। সেই অতি সকালে দুই-একটা শীত পোশাকের দরদাম করছিলাম। এমন সময় আমাদের দলনেতার ফোন– ''আমরা সব গাড়িতে পৌঁছে গেছি। আপনি তাড়াতাড়ি আসুন।" কেনাকাটা মাথায় উঠে গেল। পড়িমরি করে গাড়ির দিকে ছুটছি। আমার হাঁটুতে ব্যথা, তাই 'knee cap' পরে আছি। তবুও বারংবার ফোনের ডাকে সাড়া দিয়ে দ্রুত বেগে গাড়ি ধরার লক্ষ্যে দৌড়াচ্ছি প্রায়। রাস্তায় জ্যাম হয়ে গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়িতে উঠে বসলাম। অন্যান্যদের মুখ ভার। একজন তো বলেই বসলেন, যে তারা অনেকক্ষণ বসে আছেন। জবাবে আমি বললাম, আপনারা টাইম দিয়েছেন ৬.০০ (ছ'টা) টায়। এখন দেখুন, ছয়টা দুই (৬.০২) বাজে। দু-পাঁচ মিনিট দেরি হতেই পারে। এতে আমার কিছু করার নেই। তারা সকলেই চুপ মেরে গেল। গাড়ি ছেড়ে দিল। এবারের গন্তব্য– 'Rock Garden.'

বই-চর্চা

নজরুল-আকাশে বিচরণ

ইনাস উদ্দীন

বিদ্রোহী কবিতার শতবর্ষ উপলক্ষ্যে উভয় বঙ্গেই নজরুল চর্চার একটা ঢেউ এসেছে। একটা কবিতাকে কেন্দ্র করে কবির জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে চর্চার ব্যাপকতা, বাংলার আনাচে কানাচে তার শতবর্ষ উদযাপন — এই ঘটনা শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, বিশ্বসাহিত্যেও সম্ভবত বিরল। এই চর্চার অনুষঙ্গ ধরেই উদার আকাশ প্রকাশনীর কর্ণধার ফারুক আহমেদ সম্পাদনা করেছেন বিষয় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একগুচ্ছ নিবন্ধের সংকলন 'বিস্তীর্ণ আকাশ জুড়ে কাজী নজরুল ইসলাম'।

সূচিপত্রের পাতায় চোখ বুলিয়ে নিলেই বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, নজরুল অনুরাগী এবং অনুসন্ধিৎসু মানুষজনের কাছে পুস্তকটি কতখানি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। ২৮ জন প্রাবন্ধিক, প্রায় সকলেই নজরুল চর্চায় যথেষ্ট সুপরিচিত; তাঁদের ৩০টি নিবন্ধে সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহী কবি-মানুষটির সৃষ্টি জীবন, ব্যক্তি জীবন, অন্তর্জীবন, তার মনলোক সুরলোক—এমনকি কিংবদন্তি হয়ে ওঠা তাঁর সৃষ্টিগুলিকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচিত নিবন্ধগুলিকে মোটামুটি ভাবে চার ভাগে ভাগ করা যায়। 'বিদ্রোহী' কবিতা কেন্দ্রিক আলোচনা, কবির চিন্তা জগত অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, সাম্যবাদ ও অসাম্প্রদায়িকতা ভাবনায় কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুলের গান এবং কবির ব্যক্তিজীবনের অন্তরঙ্গ কথা। সিংহভাগ জুড়ে, প্রায় দশটি নিবন্ধে আছে 'বিদ্রোহী' কবিতার অনুষঙ্গে নানান প্রাসঙ্গিক আলোচনা। 'দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহীর বিদ্রোহ-বাণ। অনেক লেখক শুধু ঈর্ষান্বিত হয়ে লিখে ফেললেন—ব্যঙ্গ কবিতা, প্যারডি.... বাংলায় রবীন্দ্রাচ্ছন্ন কবিতার পাঠক এবং অ-পাঠক সবাইকে প্লাবিত করল—একুশ বছরের এক কবির একটি মাত্র কবিতা' —প্রাবন্ধিক সুরঞ্জন মিদ্দে বিদ্রোহী কবিতার নানা প্রাসঙ্গিক দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার স্থানিক বর্ণনা, প্রকাশের পর বঙ্গ-সাহিত্য সমাজে অভাবনীয় আলোড়নের বিবরণ, ভাবের সাথে বিষয় বৈচিত্র্যে, এমনকি সম্প্রীতি ও মিথের ক্ষেত্রেও বিদ্রোহের প্রকাশ—'বিদ্রোহী' নিয়ে নিবন্ধটি যেন একটি সর্বাঙ্গীণ আলোচনা। নজরুলের গজল বিষয়ে সুপরিচিত আলোচক অধ্যাপক আবুল হাসনাত একজন অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিকোণে 'বিদ্রোহী' কবিতায় সন্ধান করেছেন। এখানে রয়েছে সুফি সাধক মনসুর হাল্লাজ থেকে শুরু করে ফারসি কবি হাফেজ, রুমি, ইংরেজ কবি শেলী, এমনকি মাইকেল মধুসূদনের বিদ্রোহ ভাবনার ছায়াপাত। আলোচনা প্রসঙ্গে চলে এসেছে বিশ্ব সাহিত্যে বিদ্রোহ চেতনার নানান উদাহরণ। একই ধারায় 'বিদ্রোহী' কবিতায় আঙ্গিকগত দিক দিয়ে চারজন কবি—হুইটম্যানের 'সং অফ মাইসেল্ফ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', সুইনবার্গের 'হার্থা' এবং মোহিতলাল মজুমদারের 'আমি' কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হবার দিকটি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন প্রাবন্ধিক কামরুজ্জামান। মাত্র একখানা কবিতা লিখে তাবৎ সুধী সমাজে একজন কবি কিভাবে একই সঙ্গে আশ্চর্য রকমের 'নন্দিত' এবং 'নিন্দিত' হয়েছিলেন—সমকালের পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য চয়ন করে তার একটা বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি। এছাড়াও শতবর্ষে 'বিদ্রোহী' কবিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে লিখেছেন মীরাতুন নাহার, মিতালী সরকার, কুমারেশ চক্রবর্তী এবং

চৈতি চক্রবর্তী। স্বাভাবিক কারণেই 'বিদ্রোহী' কবিতার মুদ্রণ দিয়ে পুস্তক আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে পুস্তকটিকে বিশিষ্টতা প্রদান করেছে গিয়াস উদ্দিন দালাল-কৃত বিদ্রোহী কবিতার ইংরেজি অনুবাদ 'দ্য রিবেল'।

নজরুল মননে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা, সর্বোপরি মানবতা নিয়ে চিন্তার খোরাক যোগানো বেশ কিছু নিবন্ধ এই পুস্তকের অন্যতম সম্পদ। 'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবতাবাদী দার্শনিক, নজরুল ইসলাম স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চেতনার সূত্র ছিল বিশ্বাত্মকবোধ, নজরুল ইসলামের আন্তর্জাতিক চেতনার সূত্র ছিল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা' — কবির মননে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে কীভাবে আন্তর্জাতিকতা বোধ গড়ে উঠেছিল তা অসাধারণ দক্ষতায় পরতে পরতে বিশ্লেষণ করেছেন পরিচিত নজরুল গবেষক সুমিতা চক্রবর্তী। 'নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ'—সবার উপরে মানবতায় বিশ্বাসী বলেই তিনি ছিলেন যে কোনো দেশের স্বাধীনতার পক্ষে। তুরস্কে কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, মিশরে চিরঞ্জীব জগলুল কিংবা রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের প্রতি কবির যে উচ্ছ্বাস—তা সবই ছিল এই আন্তর্জাতিকতা বোধের প্রকাশ। নজরুল ইসলামের জাতীয়তাবাদের রূপ ও তার প্রকাশকে তুলে ধরতে তার প্রবন্ধগুলি নিয়ে একটি মূল্যবান আলোচনা করেছেন মিরাজুল ইসলাম। এই জাতীয়তাবাদ মানবতাবাদে পুষ্ট, সংকীর্ণ নয়। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়দের একজোট হওয়া, দেশবাসীর মনে স্বদেশীয় চেতনার সঞ্চার ঘটানো—এটাই ছিল কবির জাতীয়তাবোধের চেহারা। এই চেতনা থেকেই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কবির মনে কীরকম আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' প্রবন্ধকে সামনে রেখে সে প্রসঙ্গে প্রাঞ্জল আলোচনা করেছেন অনিকেত মহাপাত্র। নজরুল চেতনায় সম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ওঠা সাম্যবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন সোনিয়া তাসনিম খান। তবে মুর্শিদাবাদের সাথে বিদ্রোহী কবির লতায় পাতায় জড়িয়ে থাকা সম্পর্কের বর্ণনা করতে গিয়ে কবির অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের এক গভীর বিশ্লেষণ করেছেন সাংবাদিক অনল আবেদিন। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতি গবেষক শক্তিনাথ ঝা-এর কথা 'মুর্শিদাবাদ জেলা নজরুল সংগীতের যৌবনের উপবন' উদ্ধৃত করে নজরুলের সঙ্গীতে অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সন্ধান করেছেন তিনি। একদিকে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত, কাশিমবাজার রাজ বাড়ির সঙ্গীতের নিজস্ব ধারা, লালবাগের শিয়া সম্প্রদায়ের নবাব পরিবারের সুফি ঘরানার উদার সংস্কৃতি, লোকায়ত ইসলামী ঐতিহ্যের নানান বৈচিত্র্য, তার সাথে নজরুল চেতনায় গভীরভাবে মিশেছিল যোগগুরু বরদাচরণ মজুমদারের শক্তি সাধনার ধারা। নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা প্রসঙ্গে অনল আবেদিনের বক্তব্য উদ্ধৃত করি—'মানুষ' কবিতার লেখকের সাংস্কৃতিক চেতনা কতটা ইসলামিক, আর কতটা অনৈসলামিক? এই কূটতর্কে আজও দুই বাংলার বাঙ্গালীদের অনেকে জেরবার। সম্প্রদায়গত ধর্মের বন্ধন সত্যিই মানুষের আত্মিক সম্পর্ক গড়তে পারলে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের জন্ম হতো না, বিশ্বে প্রায় ডজন দুয়েক ইসলামিক রাষ্ট্রের পৃথক অস্তিত্ব থাকত না'।

নজরুলের সঙ্গীত জীবন নিয়েই বোধ হয় একশো গ্রন্থ লেখা যায়, গবেষণা করা যায়। প্রথাগত কোনও শিক্ষা, অনুশীলন, পরিশীলন ছাড়াই তিনি সঙ্গীতের গভীরতর জগতে যেভাবে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন, স্বতোৎসারিত ধারায় তাৎক্ষণিকভাবে বাণী ও সুরের অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটিয়ে যেসব সঙ্গীত রচনা করেছেন তা বোধহয় গবেষকেরও অগম্য। এই পুস্তকে নজরুলের সঙ্গীত বিষয়ে দুটি অত্যন্ত মূল্যবান নিবন্ধ সংকলিত হয়েছে। অধ্যাপক আবুল হাসনাতের 'নজরুলের গানে ট্রাজিক ভিশনঃ বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে' এবং মোহাম্মদ শামসুল আলমের 'পরিশীলন বৈচিত্র্যে নজরুলের গান'। দেশাত্মবোধক, ভক্তিমূলক, গজল, রাগসঙ্গীত, লোকগান, হাসির গান, বিদেশি সুর, লুপ্ত রাগ—বলতে গেলে নজরুল সঙ্গীতের প্রতিটি শাখায় নিপুণভাবে বিচরণ করেছেন শামসুল আলম। নজরুলের গজল নিয়ে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু আবুল হাসনাত 'বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে' — মাত্র একটি গানকে সামনে রেখে অসাধারণ দক্ষতায় তিনি আমাদের ভ্রমণ করিয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরের সঙ্গীত সরণিতে, ইরাণের নওরোজে কোনো এক সমাধিলগ্নার পাশে। বুলবুলি যেন নজরুল নামক এক আজীবন ট্র্যাজিক সত্তার প্রতীকী কণ্ঠ, লেখকের ভাষায় 'বিশ্বব্যাপী অশ্রু আয়োজন'।

নির্যাতিত শ্রমিক, কৃষক, জেলে, মজুর, বারাঙ্গনা—যার পক্ষেই কলম ধরুন না কেন, নজরুলের একটাই মুখ্য পরিচয়—তিনি মানুষের কবি, মানবতাই তার চিন্তনের একমাত্র বিষয়। প্রাবন্ধিক আমিনুল ইসলাম নজরুল সাহিত্যের সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে তুলে ধরেছেন সেই সার কথাকেই। এই পর্বে নজরুল সাহিত্যে শ্রমজীবী মানুষ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন আবেদা সুলতানা, কবির সাংবাদিক জীবন নিয়ে তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন গোলাম রাশিদ, ধূমকেতুতে প্রথম পূর্ণ স্বরাজের দাবির বিবরণ বিস্তারিত তুলে ধরেছেন সোমঋতা মল্লিক। এছাড়া নজরুলের কবিতায় ঈদ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন সা'আদুল ইসলাম, শিশু সাহিত্য প্রসঙ্গে লিখেছেন মোহাম্মদ এরশাদুল হক, বিষয়-স্বাতন্ত্র্য নিয়ে লিখেছেন বর্ণালী হাজরা।

বৈচিত্র্যপূর্ণ নজরুল জীবনের নানা অন্তরঙ্গ দিক নিয়ে লিখেছেন কল্যাণী কাজী, মইনুল হাসান (ফজিলতুন্নেসা প্রসঙ্গে), সৈয়দ মাজহারুল পারভেজ, মোশারফ হোসেন প্রমুখ। চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাত্রাপথে বোম্বাই শহরে কাজী নজরুল ইসলামের সম্মানে সম্বর্ধনা সভার বিবরণ সম্ভবত এক অভিনব সংযোজন। এই বঙ্গে নজরুল গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ আজহারউদ্দীন খানের একটা সাক্ষাৎকারধর্মী মূল্যবান বিবরণ তুলে ধরেছেন বিশিষ্ট গবেষক শেখ মকবুল ইসলাম।

ধূমকেতু সহ হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া নজরুল নামক এক বিস্তীর্ণ আকাশের অনেক ছবি উঠে এসেছে এই পুস্তকে, তবু মনে হয় আরো কিছু ছবি অনালোকিত থেকে গিয়েছে—যেমন কবির কৃষ্ণনগর পর্ব। কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিশীল জীবনের সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে তাঁর কৃষ্ণনগরে তিন বছরের বসবাস কাল। মুর্শিদাবাদে বসবাস না করলেও তার সাথে কবির জীবনের বিভিন্ন সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে। কিন্তু হাবিলদার কবি, বিদ্রোহী কবি, রাজনীতিতে ভোটে দাঁড়ানো লাঙ্গলের কবি, দারিদ্র্যের কবি, অসি ছেড়ে বাঁশি ধরা গজলের কবি—সব ধারার সঙ্গমস্থল কবির এই কৃষ্ণনগর পর্ব। কিন্তু এই সম্পর্কে একটা নিবন্ধ কেন, একটা লাইনও উল্লেখ নেই। শুধু তাই নয়, কবির তিন বছরের কৃষ্ণনগর পর্ব নিয়ে নজরুল গবেষকদের অনিচ্ছাকৃত উদাসীনতার একটা প্রতিফলনও চোখে পড়ল পুস্তকের ১৩৪ পৃষ্ঠায়। কবির স্মৃতিধন্য হেরিটেজ ভবন, বলতে গেলে আলাদাভাবে অক্ষত থাকা কবির একমাত্র বাসভবন 'গ্রেস কটেজ' উল্লেখিত হয়েছে 'গ্রেট কটেজ' হিসেবে। এই ভ্রান্তি কিংবা উদাসীনতার জন্য শুধু লেখক কিংবা সম্পাদককে দায়ী করা চলে না, কারণ সামগ্রিকভাবে নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে কৃষ্ণনগর পর্ব খুবই কম আলোচিত। না বললেও চলে, তবু দু'একটি মুদ্রণ প্রমাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। পুস্তকের ৮২ পৃষ্ঠায় এক জায়গায় উল্লেখ হয়েছে '১৯৪০ সালের মে মাসে বসন্ত রোগে বুলবুলের মৃত্যু হয়'। আর এক জায়গায় দেখলাম 'লাঙল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় '১৯৫২ সালে ডিসেম্বর মাসে'। এগুলি অবশ্যই খুব সাধারণ মুদ্রণ প্রমাদ, ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। তবুও গুরুত্বপূর্ণ সাল তারিখের ক্ষেত্রে সম্পাদকের আরেকটু যত্নবান হওয়া কাম্য ছিল।

যাইহোক, বিষয় বৈচিত্র্যে এবং গবেষণাধর্মী গুণমানে সমৃদ্ধ এরকম একটা মূল্যবান সংকলন উভয় বঙ্গের নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

বিস্তীর্ণ আকাশ জুড়ে কাজী নজরুল ইসলাম
সম্পাদন : ফারুখ আহমেদ
উদার আকাশ, কলকাতা
১০০/-

অরঙ্গাবাদে সাহিত্য-সভা

'নতুন প্রহরী' পত্রিকার উদ্যোগে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ অরঙ্গাবাদ বি এড কলেজের সভাগৃহে উত্তর মুর্শিদাবাদ সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের ১৯ তম সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কবি আবু রাইহান। কবি রফিকুল ইসলাম, জুলফিকার আলি, জাহানারা বেগম প্রমুখ বিশিষ্ট অতিথি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সাহিত্যে ৫ জনকে 'সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ' সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া সমাজসেবায় ৪ জনকে 'নাথুলাল দাস' সম্মাননা এবং সাংবাদিকতা, সম্পাদনা ও শিল্পকলায় ৪ জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নতুন প্রহরী পত্রিকার সম্পাদক মোফাক হোসেন।

মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে ভাষাদিবস পালন

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে শহিদ হন মুর্শিদাবাদের সালারের বাবলা গ্রামের আবুল বরকত। বাবলা গ্রামের পাশাপাশি, বহরমপুর, লালবাগ, লালগোলা, ডোমকল, কান্দি, সালার সহ জেলার সমস্ত স্কুল কলেজে মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। বাবলা গ্রামে 'বরকত স্মৃতি সঙ্ঘের' আয়োজনে ওই দিন মেলা বসে। সালারের ডাকবাংলো মাঠেও দিনভর নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ভাষা দিবস পালিত হয়েছে। আবুল বরকত বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রাক্তনী। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে সামনে রেখে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে দু'দিন ধরে অনুষ্ঠান হয়েছে। লালবাগে মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে ভাষাদিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

কবি জয়নাল আবেদিন-এর স্মরণ অনুষ্ঠান

নদিয়ার বড় আন্দুলিয়া লোকসেবা শিবিরে সম্প্রতি (২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'কাব্যকণ্ঠ' পত্রিকা আয়োজিত প্রয়াত কবি জয়নাল আবেদিনকে নিয়ে আলোচনাচক্র, কবিতা পাঠ ও পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠান। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হজরত আলি, শফিকুল ইসলাম, দেবনারায়ন মোদক, রামকৃষ্ণ দে, সিরাজুল ইসলাম, সারিকুল ইসলাম, সঞ্জয় কুমার ঘোষ, রতন কুমার নাথ প্রমুখ গুণীজন। এছাড়া কবির পুত্র-কন্যাসহ নিকট পরিজনেরাও উপস্থিত ছিলেন। কবি জয়নাল আবেদিনকে নিয়ে স্মৃতিচারণা ও কবিতা পাঠ করেন আজিজুল হক মণ্ডল, তপন কুমার বিশ্বাস, অম্বিকা দে, দিলীপ দত্ত, ফজলুর রহমান মন্ডল, চম্পা খাতুন, নজরুল ইসলাম বিশ্বাস, ফতেমা বেগম প্রমুখ। কবি জয়নাল আবেদিন এর নামাঙ্কিত স্মৃতি পুরষ্কার প্রদান এবং কবিকে নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যার কাজ শুরু করা হয়েছে বলে জানান কাব্যকণ্ঠ সম্পাদক দীন মহাম্মদ সেখ। এ বছরের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় কথাসাহিত্যিক আনসারউদ্দিনের হাতে। অনুষ্ঠানটির সহযোগিতায় ছিল আনন্দম কথাকৃতি, চরভূমি, রোপণ, বিরুদ্ধ স্রোত, রূপসী পল্লী সহ আরও কয়েকটি স্থানীয় সাহিত্য পত্রিকা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কবি ও গায়ক সাধন পাত্র। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কবি রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

লালগোলায় চারুকলা প্রদর্শনী

সাত্ত্বিক সৌল অফ আর্ট-এর উদ্যোগে সীমান্ত শহর লালগোলার পদ্মাপাড়ে ২৩ থেকে ২৭ জানুয়ারি, ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দশম চারুকলা প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর উদ্বোধক ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী প্রদোষ পাল। প্রদর্শনী ঘিরে এলাকাবাসীর উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রদর্শনীতে আর্ট কলেজ পড়ুয়া থেকে ক্ষুদে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঁচ শতাধিক ছবি, ভাস্কর্য, ইনস্টলেশন ও ফটোগ্রাফি স্থান পায়। অ্যানিমেশন ও সৃজনাত্মক ছবি বিষয়ে দুটি সেমিনার, বিশিষ্ট শিল্পী সারফুদ্দিন আহমেদের পেইন্টিং ওয়ার্কশপ এবং তাঁর ক্যানভাসে আঁকা দুটি লাইভ পেইন্টিং দর্শক মনে যথেষ্ট সাড়া ফেলে। উদ্ভাস প্রকাশনা থেকে মোঃ মিজানুর খানের 'ভেজা তুলির ছবি' নামক একটি বইও প্রকাশিত হয়। লালগোলার মতো প্রত্যন্ত এলাকায় সাত্ত্বিক-এর এই আয়োজন যথেষ্ট সাধুবাদযোগ্য।

পত্রিকা প্রকাশ 'অনুভূতির কথায়'

মুর্শিদাবাদের ঝাউবনা গ্রাম থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হল কৃষ্টিগত সাময়িক পত্রিকা 'অনুভূতির কথায়' (৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)। হামিম হোসেন মণ্ডল সম্পাদিত তিন ফর্মার এই পত্রিকাটির প্রচ্ছদ কথন 'বন্ধুত্ব'। কলম ধরেছেন এপার বাংলা থেকে সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরী ভট্টাচার্য, আশিকুল আলম বিশ্বাস, প্রবীর দে, রাজকুমার শেখ, মুহঃ আকমল হোসেন, নাসির ওয়াদেন, সমিত মণ্ডল এবং ওপার বাংলা থেকে সোনিয়া তাসনিম খান, শাম্মী তুলতুল, রোকেয়া ইসলাম প্রমুখ। ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন আচার্য্য, কৌশিক গাঙ্গুলি প্রমুখ বিশিষ্ট কবি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

জঙ্গীপুর শিল্প-সাহিত্য উৎসব

শিল্প-সাহিত্য উৎসবের এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে জঙ্গীপুর সাহিত্য সমন্বয় পরিষদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক মুখপত্র 'উত্তরের সিঁড়ি' সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হল গত ৫ মার্চ রবিবার, ২০২৩। কথা, কবিতা ও গানে দুই বাংলার প্রায় দুইশত কবি, সাহিত্যিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মুখ্য উদ্যোক্তা ছিলেন গোলাম কাদের ও সুনীলকুমার দে।

—হাসিবুর রহমান

শেখপাড়ায় বৈশাখী সাহিত্য পত্রিকা

মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তবর্তী জনপদ শেখপাড়ায় বিগত ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে বার্ষিক 'বৈশাখী' পত্রিকা। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আজিজুল ইসলামের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই পত্রিকা শেখপাড়া-রানিনগর এলাকার জনমানসে জনপ্রিয় সাহিত্য জীবন-দর্পণে পরিণত হয়েছিল। তাঁর অকাল মৃত্যুতে স্বাভাবিক ছন্দ থেকে সাময়িকভাবে বিচ্যুত ঘটে। দুই বছর পর গত ১৯শে মার্চ, ২০২৩ একটি অনাড়ম্বর ঘরোয়া অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হল বৈশাখীর ২৯তম সংখ্যা। উদ্যোক্তাদের মধ্যে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন ডা এম এ রশিদ, ডা মইনুল ইসলাম, শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন উর্বরমন পত্রিকার সম্পাদক কবি রেজাউল করিম, অধ্যাপিকা সালমা খাতুন (জলঙ্গী মহাবিদ্যালয়), ডোমকল ভবতারণ উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্বতন শিক্ষক আতাউর রহমান, বর্তমান প্রধান শিক্ষক তপন কুমার সামন্ত, বিশিষ্ট ফটোশিল্পী বদরুদ্দোজা প্রমুখ বিশিষ্ট জন।

—গোলাম মোর্তজা

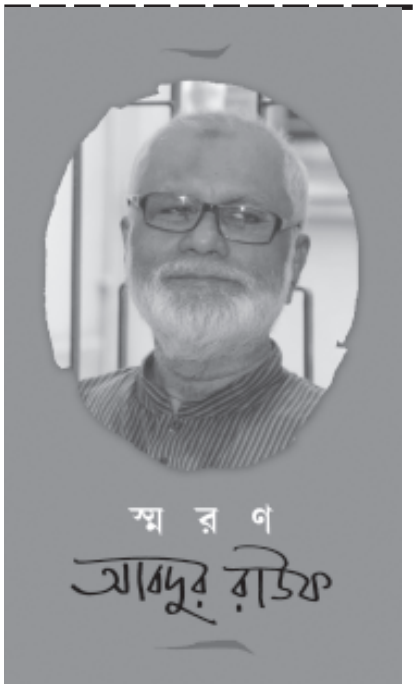

স্মরণ

আবদুর রাউফ ৩০০

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ

কলকাতা

২০২৩

যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৮৮৩০১০৬২১

প্রাপ্তিস্থান : নিউ লেখা প্রকাশনী, ধ্যানবিন্দু